স্বাবলম্বী

স্বাবলম্বী, ৩৮ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১৬

সাভার এলাকায় ভার্কের শিশু সুরক্ষা প্রকল্প: একটি অনন্য দৃষ্টান্ত

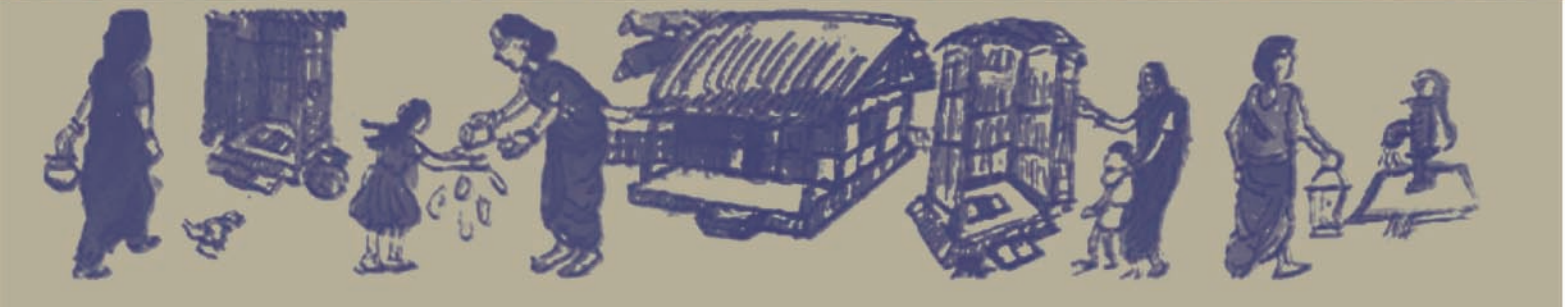

ত্রৈমাসিক

স্বাবলম্বী

স্বাবলম্বী, ৩৮ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, জানু-জুন ২০১৬

ভার্ক-এর একটি নিয়মিত প্রকাশনা
ভার্ক-এর সকল সেকশন-এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রকাশিত

আমাদের কথা

স্বাবলম্বী একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এর প্রতি সংখ্যায় যেমন উক্ত সময়কালের অন্তর্ভুক্ত দেশীয় ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ঘোষিত বিশেষ দিবসগুলোকে লক্ষ্য রেখে তথ্য পরিবেশন করা হয় তেমনি পানি-পয়ঃনিষ্কাশন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, ঋণ প্রভৃতি বিষয়ক বিভিন্ন অগ্রগতি, নতুন নতুন পদক্ষেপ ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন লেখা রাখা হয়। জানুয়ারি থেকে জুন ২০১৬ এই ছয়মাস সময়কালের অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও মাস হলো ২১ ফেব্রুয়ারী, ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ৭ এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস, ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ, ৫ জুন হিসেবে স্বীকৃত।

ভার্ক সবসময়ই টেকসই সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে। তাই সকল প্রকল্পেই ভার্ক জনগণের পাশাপাশি সেখানকার স্থানীয় সরকারকে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করে আসছে। জনগণের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণকে টেকসই সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত বলেই ভার্ক বিশ্বাস করে।

স্বাবলম্বীর প্রতিটি সংখ্যায়ই আমরা চেষ্টা করে থাকি বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত সাধারণ জনগণের সচেতনতার সিদ্ধান্তমূলক তথ্য উপস্থাপন করতে ও প্রকল্প বিষয়ক বিভিন্ন শিক্ষা সকলকে জানাতে। তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করলেও আমরা মনে করি এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে এলেই ঐসব সুবিধা বঞ্চিত জনগণকে এই সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব।

সূচিপত্র

আমাদের কথা ১

আমাদের কর্মবার্তা

সাভার এলাকায় ভার্কের শিশু সুরক্ষা প্রকল্প: একটি অনন্য দৃষ্টান্ত ২
আইবিআইজি সেকশনের প্রশিক্ষণ তথ্য জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬ ..... ৫
আইসিটি এন্ড ইনোভেটিভ পার্টনারশিপস প্রকল্প ৭
সিরাজগঞ্জে কমিউনিটির সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে শিখন প্রকল্পের ১৩টি স্কুল ৮
উৎসব মুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হল শিখন প্রকল্পের উপজেলা পর্যায় সাফল্য উদ্‌যাপন ও সমাপনী সভা ৯
শিক্ষার মূল স্রোতধারার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে শেষ হল শিখন প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে (কোহর্টে) শিখনচক্র..... ১১
সমাপণী পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করল শ্যামপুর শিখন স্কুল ১২
দিবস উদ্‌যাপন ১৪

সাফল্য গাঁথা

জীবন সংগ্রামে লনী রানীর সফলতার গল্প ১৫
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন প্রতিবেদন-২০১৬ ..... ১৫
হতাশা থেকে আশা ১৮
গ্রামটি ফিরে পেয়েছে তার প্রাণ ১৮
নিরাপদ পানির জন্য সারথীর সংগ্রাম ২০
মুহিপাড়া আদিবাসি জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা ২০
অভাবকে জয় করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন দেলোয়ারা বেগম ২২
স্বপ্নের পথে সাফল্যের সিড়ি ২৩
শিখন স্কুলের জন্য একজন বিদ্যোৎসাহী মানুষের অবদান ২৪
শিকন হামার নাতনীক নেকাপড়া শিকেইল ২৫
সুস্থ জীবন, সুন্দর পরিবেশ ২৬
স্বপ্ন পূরণে স্যানিটেশন ২৭

ছন্দে ছন্দে জনসচেতনতা

হে স্বাধীনতা ২৮
চৈত্রের প্রথম বর্ষণ ২৮

শিশু-কিশোরদের ভাবনা

পিতার্থ ২৯

স্বাস্থ্যবার্তা

চিরচেনা অ্যালোভেরা জেলের ৫টি অজানা স্বাস্থ্য উপকারিতা ৩২
জেনে নিন আদার ৮টি উপকারিতা ৩২

কৃষি জ্বালানী, পরিবেশ ও প্রযুক্তিবার্তা

ভার্ক কর্তৃক গবাদি প্রাণি-পাখির কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান ৩৩
বাংলাদেশের উন্নয়নে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ ৩৪

সুরক্ষা ও অধিকারবার্তা

জাতীয় নারী নীতিমালা ২০১১ ..... ৩৬

সম্পাদনা উপদেষ্টা
শেখ আবদুল হালিম
ইয়াকুব হোসেন
আনোয়ারুল ইসলাম
সুভাষ চন্দ্র সাহা
মঈনুল ইসলাম
মোঃ মাসুদ হাসান
আজমল খান
কামরুল ইসলাম

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
লায়লা ইশরাত জাহান রুয়েন

প্রকাশক
শেখ আবদুল হালিম
নির্বাহী পরিচালক, ভার্ক
আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা।

VERC

আমাদের কর্মবার্তা

সাভার এলাকায় ভার্কের শিশু সুরক্ষা প্রকল্প: একটি অনন্য দৃষ্টান্ত

মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো শিশুকাল। শিশুকাল বলতে আমরা বুঝব, জাতিসংঘের শিশু-অধিকার সনদ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সকল মানব সন্তানকে। মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের দৃঢ় ভিত্তি রচিত হয় শিশুকালেই। তাই, শিশুকাল হলো শেখার সময়। এ সময় শিশুরা আনন্দঘন ও নিরাপদ পরিবেশে শিক্ষা অর্জন করবে। খেলাধূলার মাধ্যমে তার শৈশবকে উপভোগ করবে এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করবে ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার জন্য। জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর প্রাপ্য হচ্ছে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা। যে সব শিশু কষ্টকর পরিবেশে বাস করছে, তাদের জন্য বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার, তার স্বাভাবিক বিকাশ, নিরাপত্তা ও অংশগ্রহণ গুরুত্বের সাথে নিশ্চিত করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুন্দর, সমৃদ্ধ ও সুশীল সমাজ বিনির্মাণে শিশুদের জন্য বিনিয়োগ বাড়ানোর বিকল্প নেই। শিশুদের জন্য বেশি বেশি সুযোগ তৈরি করে দেওয়া প্রয়োজন, যাতে শিশুরা সুষমভাবে বিকশিত ও দেশের যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু আমাদের বাস্তবতার চিত্র ভিন্ন। শিশুদের জীবন সুখকর নয়। সারা বিশ্বজুড়েই শিশুদের জীবন চলছে বৈরী স্রোতে। শিশুদের রয়েছে নানা প্রতিকূলতা ও অধিকারহীনতার বিস্তর নজির। শিশুরা দারিদ্র্যতা ও অজ্ঞতার কষাঘাতে নিষ্পেষিত। শিশুরা পুষ্টিকর খাবার ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। তারা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত ও নানা শোষণ-নির্যাতনের শিকার। আইএলও-র তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে পাঁচ থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী ১৬৮ মিলিয়ন শ্রমজীবী শিশু রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুশ্রম বিদ্যমান। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই শিশু। মোট শিশুর অর্ধেক শিশু দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। স্কুলে শিশু ভর্তির হার বাড়লেও ঝরে পড়ার হার কমেনি। স্কুলে ভর্তি হওয়া শিশুর ৪০ ভাগ শিশুই পঞ্চম শ্রেণি পাস করার আগে ঝরে পড়ে। শতকরা কতজন শিশু অষ্টম শ্রেণি পাস করতে পারে, কতজন শিশু এসএসসি ও এইচএসসি পাস করে-এর সঠিক হিসেব পাওয়া যায় না। অধিকাংশ শিশুই শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। শিশু ঝরে পড়ার প্রধান কারণ হলো দারিদ্র্যতা ও স্কুলে শিক্ষার বৈরী পরিবেশ। ঝরে পড়া এ সকল শিশুরা যায় কোথায়? যে বয়সে একটি শিশুর বই, খাতা, পেন্সিল নিয়ে স্কুলে আসা-যাওয়া করার কথা, মাঠে খেলার কথা, আনন্দে থাকার কথা, সে বয়সে আমাদের শিশুদেরকে নেমে পড়তে হয় জীবিকার সন্ধানে। এভাবে শিশুরা তাদের শৈশব হারিয়ে ঢুকে পড়ছে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে। এর মধ্যে রয়েছে হোটেল-রেস্তোরাঁ, ফ্যাক্টরি, ওয়ার্কশপ বা বাসা-বাড়িতে কাজ, বোঝা টানা, মিস্ত্রি, ভিক্ষাবৃত্তিতে ব্যবহার, রিকসা বহন, ঠেলাগাড়ি টানা, বিড়ি বাঁধা ইত্যাদি।

২০০৩ সালে বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্টেটিসটিক (বিএসএস) ও আইএলও'র সার্ভে মতে বাংলাদেশে ৭৮ লক্ষ শিশু অর্থনৈতিক কর্মে নিযুক্ত, এর মধ্যে ৩২ লক্ষ শিশু শিশুশ্রমে নিয়োজিত এবং ১৩ লক্ষ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে যুক্ত। ইউনিসেফ ও আইএলও'র ২০০৭ সালের সার্ভে দেখা যায়, ৪.২ লক্ষ শিশু গৃহ-শ্রমিক হিসেবে কাজ করে, যার শতকরা ৮৩ ভাগই মেয়ে শিশু। এ সব শিশু গড়ে প্রতিদিন ১৪ ঘন্টা কাজ করে এবং এদের গড় মাসিক বেতন ৫০৯ টাকা মাত্র।

শিশুকে বিশেষ যত্ন প্রদানের প্রয়োজনীয়তার কথা ১৯২৪ সালের জেনেভা ঘোষণায় বলা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার সনদ অনুমোদিত। এই সনদে বলা হয়েছে, "শিশুর শারীরিক ও মানসিক অপরিপক্কতার কারণে তার জন্মের আগে ও পরে তার জন্য উপযুক্ত আইনগত সুরক্ষাসহ বিশেষ রক্ষাকবচ ও যত্ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন"। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে শিশু অধিকার সনদ স্বাক্ষর করেছে। এই শিশু অধিকার সনদটি শিশুদের অধিকারের একটি পরিপূর্ণ দলিল। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার আইএলও কনভেনশন ১৮২ স্বাক্ষর করেছে, যাতে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার "জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০" গ্রহণ করে এবং ২০১৬ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম দূরীকরণে জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে শিশুনীতি তৈরি করেছে। ২০১৩ সালের ১৬ জুন জাতীয় সংসদে চিলড্রেন এ্যাক্ট (শিশু আইন) পাশ করেছে। কিন্তু দুর্বল বাস্তবায়নের কারণে শিশুদের রাতের যবনিকা হয়নি।

সাভারের প্রেক্ষাপট:

সাভার উপজেলায় শিশুদের করুণ চিত্র আরো ভয়াবহ। কারণ, সাভারের আর্থ-সামাজিক ও ভৌগলিক অবস্থান। সাভার বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা সিটির লাগুয়া শহর। বংশী নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটিতে গড়ে উঠেছে শত-শত ছোট-বড় শিল্প কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। ক্রমবর্ধমান এসব কলকারখানার মধ্যে রয়েছে-সিরামিক কারখানা, কোমল পানীয়, প্রেস, গার্মেন্টস, জুতা কারখানা, পাটকল, টেক্সটাইল মিল, ডাই ও প্রিন্টিং কারখানা, ট্রান্সফরমার কারখানা, অটোমোবাইল, বিস্কুট ও ব্রেড, ঔষধ শিল্প কারখানা, সাবান কারখানা, ইট ভাটা, হিমাগার, ওয়েল্ডিং কারখানা, বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল ও ঢাকা রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল প্রভৃতি। এ সকল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিল্প-কারখানার চারপাশে গড়ে উঠেছে শ্রমিক কলোনী ও বস্তি। প্রায় পনের লক্ষ মানুষের অধ্যুষিত এই উপজেলার সাক্ষরতার হার মাত্র ৬৪% হার।

অপরিকল্পিত কারখানা বর্ধিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক পরিবারের সমাগম ঘটেছে এবং তারা এ সকল কলকারখানার কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। তাদের বসবাসের জন্য সাভারে বস্তি এলাকার সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। অধিকন্তু এই বর্ধিত রীতি বহির্ভূত সেক্টরে বিপুল সংখ্যক শিশু কাজ করে-যাদের অনেকে বিপদজনক পরিস্থিতিতে কাজ করে। যার মধ্যে ওয়েল্ডিং, লৌহ ও স্টিল রিসাইক্লেনিং, চামড়া কারখানা, অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, লেদ মেশিন এবং প্রায় শতাধিক মাঝারি কারখানা আছে। অপরদিকে এখানে আরো তাৎপর্যপূর্ণ যে, আবাসিক এলাকায় গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এসব শিশু দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপন করছে। আরো পাওয়া গেছে যে, সাভার এলাকার বংশী নদীর তীরে প্রায় দশ হাজারের মতো বেদে পরিবার বসবাস করে। তারা নীচু জাতি হিসেবে বিবেচ্য ও কমিউনিটি থেকে বিচ্ছিন্ন। এসব পরিবারের অনেক শিশুর কমিউনিটির স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের প্রবেশাধিকার নেই এবং তাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক শিশু ইনফরমাল সেক্টরে কাজ করে।

এখানে বিপুল সংখ্যক পথশিশু আবর্জনার স্তূপ থেকে ছেঁড়া কাগজ, পলিথিন ও প্লাস্টিক টোকানোর কাজে নিযুক্ত, যা বড় ধরনের ঝুঁকি বহন করে। শিশুরা হাসপাতালে বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থায় খোঁজাখুঁজির কাজ করে, যার ফলে তারা চর্মরোগ, ডায়রিয়া, আমাশয়, ভাইরাস জ্বর, জন্ডিস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়। এসব শিশুর অনেকে রাস্তায় বসবাস করে। এটা প্রকাশিত যে, এ ধরনের পথশিশুরা দিনে ৩০-৫০ টাকা আয় করে। এ সকল শিশু বিভিন্নভাবে শোষিত হয়। একদিকে তারা ব্যবসায়ীদের দ্বারা কম পারিশ্রমিক পায়, অন্যদিকে মাস্তানদের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হওয়ায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে হয়রানির শিকার হয়। যেহেতু জীবিকা ও পরিবারকে সহায়তার জন্য আয় করতে হয়, তাই তাদের কারো স্কুলে যাওয়ার সুযোগ নেই।

বিপুল সংখ্যক শিশু চামড়া কারখানায় জুতা প্রস্তুতের কাজ করে। জুতা কারখানায় শিশু শ্রমিকরা চামড়া কাটা, জুতা তৈরির রাবার ট্রিম করা, রাবার সোলে রাসায়নিক আঁঠা লাগানোর কাজ করে। শিশুদের পক্ষে নিয়মিত আঁঠা লাগানোর কাজ অত্যন্ত বিপজ্জনক। তারা সাধারণত সকাল ৯টায় কাজ শুরু করে এবং মধ্যরাত পর্যন্ত চলতে থাকে। তারা শুধুমাত্র খাওয়ার জন্য দিনে দু'বার বিরতি পায়। এই শিশু শ্রমিকরা মৌখিক ও শারীরিকভাবেও নির্যাতিত হয়। জুতার কারখানার কাজের পরিবেশ খুবই অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক। এখানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। জুতা তৈরির জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক আঁঠা শ্বাস প্রদাহের কারণ। শিশুদের অনেকের মধ্যে আঁঠার গন্ধ নেওয়ার আসক্তি তৈরি হয় এবং কোমর ব্যথা শিশু শ্রমিকদের অনেক সমস্যার মধ্যে একটি সাধারণ সমস্যা।

বিপুল সংখ্যক শিশু স্টিল পণ্য উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত। এসব কারখানার সার্বিক পরিবেশ যথেষ্ট খারাপ। এখানে শিশু শ্রমিকদের কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই। শ্রমিকরা

সাধারণত নিজেদের কোন সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই স্প্রে করে। স্প্রের গ্যাস ও রঙের গুঁড়া যথেষ্ট বিপজ্জনক। শিশুদেরকে তাদের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা বহন করার কাজ দেওয়া হয়। সেখানে সবসময়ই শারীরিক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। অনেক শিশুকে আবার কাজের জায়গায় থাকতে হয়। তারা বড়দের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। একইভাবে সাভার উপজেলায় বিরাট সংখ্যক ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ, গাড়ি মেরামত কারখানা, কেমিক্যাল, প্রেস, সাবান তৈরি, ইটভাটা, জুটমিল, টেক্সটাইল মিল, বিস্কুট ও ব্রেড ফ্যাক্টরি, ডায়িং ফ্যাক্টরি ইত্যাদি আছে, যেখানে শিশুদের জন্য কাজের পরিবেশ খুবই বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ।

সাভার উপজেলার এসব শিশু শ্রমিক বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে কাজ করে। শিশুরা চরম দারিদ্র্যতা, পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু, বাবা-মার বিচ্ছেদ, মা-বাবার কাছ থেকে পরিত্যক্ত হওয়াও তার মধ্যে বিদ্যমান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আয় করার জন্য কাজ করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে নিয়োগদাতারাও দেখে কম পারিশ্রমিকে শিশুদের নিয়োগ করা যায় এবং শিশুদেরকে কম পারিশ্রমিকে সম্মত করানো আরো বেশি সম্ভব। অন্যদিকে গৃহকর্মে নিয়োজিত সকল শিশু শ্রমিকও শোষণ ও নির্যাতনের শিকার।

সাভারে ভার্কের শিশু সুরক্ষা প্রকল্প:

সাভার উপজেলার দুর্দশাগ্রস্ত এসব শিশুর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)। ভার্ক উপজেলার (সাভার পৌরসভা, পাথালিয়া, তেঁতুলঝোড়া ও ধামসোনা ইউনিয়ন) টিডিএইচ নেদারল্যান্ড-এর আর্থিক সহযোগিতায় ২০১২ সাল থেকে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের নিয়ে শিক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

সাভার উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা এবং যে সকল শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের সুরক্ষার জন্য এ প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশু এবং গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের জন্য অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে সকল শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে যুক্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, তাদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র করা হয়েছে। একই সাথে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুর জন্য নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ তৈরি, কর্মঘণ্টা কমানো, ন্যায্য বেতন, লেখাপড়া ও বিনোদনের সুযোগ তৈরির জন্য অভিভাবক ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের শিশু অধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে তাদের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে শিশুকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তাদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

এ প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এখানে শিশু সুরক্ষা বলয় তৈরির লক্ষ্যে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ১০টি কর্ম এলাকাতে ১০টি এলাকাভিত্তিক শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি এবং ১০টি এলাকা থেকে প্রতিনিধি নিয়ে ১টি উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এলাকাভিত্তিক কমিটিগুলো নিজ নিজ এলাকায় শিশুশ্রম, অপব্যবহার ও শোষণ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখছেন এবং শিশু কোন ধরনের নির্যাতনের শিকার হলে বিষয়টি উপজেলা কমিটিকে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষায় কাজ করছেন। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা ২০১০ প্রণয়ন করেছে। নীতিমালাটি প্রচার করা, নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে এডভোকেসি ও লবিং করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সাভার উপজেলার স্থানীয় এনজিও, সাংবাদিক, শিশু সুরক্ষা প্রতিরোধ কমিটি ও স্থানীয় সরকারের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্যদের শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সক্ষমতা উন্নয়ন করা যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গা থেকে ভূমিকা রাখতে পারে।

শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের লক্ষ্য:

সাভার উপজেলার শ্রমে নিয়োজিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম, শোষণ ও নির্যাতন থেকে নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা।

শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. সাভার উপজেলার শ্রমে নিয়োজিত ও সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম, শোষণ ও অপব্যবহারের হাত থেকে সুরক্ষা।

২. এডভোকেসি ও লবিং-এর মাধ্যমে নাগরিক সমাজ, নীতি নির্ধারক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিকদের শিশু সুরক্ষা, শোষণ ও অপব্যবহার প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধকরণ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের কার্যক্রম:

শিশুদের নিরাপত্তা ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন একটি শিশু সুরক্ষা বলয় তৈরি করা। এ জন্য শিশুর চারপাশে শিশু অধিকার বিষয়ে জ্ঞাত, সচেতন ও উদ্বুদ্ধ অনেক মানুষের প্রয়োজন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিশু অধিকার-এর উপর দক্ষ ও উদ্বুদ্ধ লোকবল তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য শিশু অধিকার বিষয়ে অনেক ওরিয়েন্টেশন, ট্রেনিং, আলোচনা, সভা-সেমিনার প্রভৃতির আয়োজন করা হয়েছে।

(চলবে)

-এস এম মাসুদুল ইসলাম, ভার্ক

আইবিআইজি সেকশনের প্রশিক্ষণ তথ্য জানুয়ারি-জুন ২০১৬

- গত ১৭-১৯ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে ভার্ক-এর প্রধান কার্যালয়ে ৩ দিনের একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল 'ঋণ কার্যক্রম বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ'। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ২৫ জন। এর মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ছিল ৬ জন এবং পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ছিল ১৯ জন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ফিল্ড সুপারভাইজারদের ঋণ কার্যক্রমের নীতিমালা বিষয়ক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ভার্ক-এর মান্দা এরিয়া অফিসে ১ দিনের একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল 'স্টাফ ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং'। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৩৬ জন। এর মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ছিল ৯ জন এবং পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ছিল ২৭ জন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল ঋণ কার্যক্রমের নীতিমালা ও সমিতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত ফেব্রুয়ারি ২০১৬-তে ভার্ক প্রধান কার্যালয়ে ৩ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ২৫ জন ফিল্ড সুপারভাইজার। এর মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ছিল ৮ জন এবং পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ছিল ১৭ জন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত ১৩-১৪ মার্চ ২০১৬ তারিখে ভার্ক-এর প্রধান কার্যালয়ে ২ দিনের একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল 'অগ্রসর ঋণ ব্যবস্থাপনা'। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ২৫ জন। এর মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ছিল ৬ জন এবং পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ছিল ১৯ জন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল 'অগ্রসর ঋণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত ১৫-১৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে ভার্ক-এর প্রধান কার্যালয়ে ২ দিনের একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল 'হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা'। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ২৫ জন। এর মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ছিল ৩ জন এবং পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ছিল ২২ জন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ঋণ কার্যক্রমের হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত ১৭-২১ জানুয়ারি ২০১৬-তে সিডিএফ-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা। ভার্ক প্রধান কার্যালয় হতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ২ জন ফিল্ড সুপারভাইজার। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত ১৭-২১ জানুয়ারি ২০১৬-তে INM-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫ দিনের একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল "সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা"। ভার্ক হতে একজন ফিল্ড সুপারভাইজার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত ১৪-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬-তে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫ দিনের একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল "সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা"। ভার্ক হতে ২ জন সিনিয়র সুপারভাইজার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত ১৫-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬-তে সিডিএফ-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৪ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা। ভার্ক প্রধান কার্যালয় হতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন একজন সিনিয়র সুপারভাইজার। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬-তে পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল উচ্চতর ক্ষুদ্রঋণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা। ভার্ক প্রধান কার্যালয় হতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন একজন সহকারী সমন্বয়কারী। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল উচ্চতর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত জানুয়ারি-মার্চ কোয়ার্টার ২০১৬-তে ঋণ কার্যক্রমের বিভিন্ন শাখায় 'দলনেত্রী প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। এই কোয়ার্টারে ৬৭ ব্যাচ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ১৮৬০ জন। ভেন্যু ছিল সাভার, কালিয়াকৈর, সিংগাইর, মাধবদী, বন্দর, সোনারগাঁ, সীতাকুন্ড, ভোলাহাট ও মোহনপুর এরিয়া।

- UPP-Ujjibito প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত উপকারভোগীদের আয়বর্ধন কর্মকান্ডে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ছাগল পালন প্রশিক্ষণ অন্যতম। ছাগল পালন বিষয়ে ২ দিন করে ২ ব্যাচ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৫০ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।
- UPP-Ujjibito প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত উপকারভোগীদের আয়বর্ধন কর্মকান্ডে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে বাঁশ ও বেত প্রশিক্ষণ অন্যতম। বাঁশ ও বেত বিষয়ে ১২ দিনের ১ ব্যাচ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ব্যাচে ২৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।
- গত ০৩-০৫ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে ভার্ক-এর প্রধান কার্যালয়ে ৩ দিনের একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল 'ঋণ কার্যক্রম বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ'। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৩৪ জন। এর মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ছিল ১০ জন এবং পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ছিল ২৪ জন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত ফিল্ড সুপারভাইজারদের ঋণ কার্যক্রমের নীতিমালা বিষয়ক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত ২৯-৩১ মে ২০১৬ তারিখে ভার্ক-এর প্রধান কার্যালয়ে ৩ দিনের একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল 'ঋণ কার্যক্রম বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ'। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ২০ জন। এর মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ছিল ৫ জন এবং পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ছিল ১৫ জন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত ফিল্ড সুপারভাইজারদের ঋণ কার্যক্রমের নীতিমালা বিষয়ক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত ১৯ জুন ২০১৬ তারিখে ভার্ক-এর প্রধান কার্যালয়ের সাভার শাখায় ১ দিনের একটি ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কসপের বিষয় ছিল 'ঋণ কার্যক্রমে দক্ষতা উন্নয়ন'। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ১৭ জন। এর মধ্যে মহিলা ফিল্ড সুপারভাইজার ছিল ১২ জন এবং পুরুষ ফিল্ড সুপারভাইজার ছিল ৪ জন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল ঋণ কার্যক্রমের সার্বিক কার্যক্রম ও নীতিমালা বিষয়ক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত ১৭-২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর আয়োজনে ইনস্টিটিউট অফ মাইক্রোফাইন্যান্স-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫ দিনের একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল 'Microenterprise (ME & Small & Medium Enterprise (SME) Operation and Management'। ভার্ক হতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ২ জন সিনিয়র সুপারভাইজার। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত ৫-৭ মে ২০১৫ তারিখে সিডিএফ-এর উদ্যোগ ও আয়োজনে সিডিএফ-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩ দিনের একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল 'হিসাব ও আর্থিক' ব্যবস্থাপনা। ভার্ক হতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ১ জন সিনিয়র সুপারভাইজার। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত ০৮-১০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর আয়োজনে ইনস্টিটিউট অফ মাইক্রোফাইন্যান্স-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩ দিনের একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল 'Advanced Microfinance & Institutional Management'। ভার্ক হতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ১ জন সিনিয়র সুপারভাইজার। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল উচ্চতর ক্ষুদ্র ঋণ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত ১৮-২২ জুন ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর আয়োজনে ইনস্টিটিউট অফ মাইক্রোফাইন্যান্স-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৪ দিনের একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল 'Enterprise Management and Promotion of Private Business'। ভার্ক হতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ২ জন সিনিয়র সুপারভাইজার। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও ব্যবসার উন্নয়ন বিষয়ক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- গত এপ্রিল-জুন ২০১৬ কোয়ার্টারে ঋণ কার্যক্রমের বিভিন্ন শাখায় 'দলনেত্রী প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। এই কোয়ার্টারে ১২ ব্যাচ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৩৮০ জন। ভেন্যু ছিল সাভার, সিংগাইর, কালিয়াকৈর ও বন্দর এরিয়া।
- গত এপ্রিল-জুন ২০১৬ কোয়ার্টারে কৃষি ও প্রাণী সম্পদ ইউনিট প্রজেক্টে মৎস্য বিষয়ক খামারী ৩ ব্যাচ প্রশিক্ষণ, কৃষক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ৬ ব্যাচ প্রশিক্ষণ, প্রাণী সম্পদ বিষয়ে ৫ ব্যাচ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৩৫০ জন। প্রতিটি প্রশিক্ষণ-এর মেয়াদ ছিল ২ দিন। ভেন্যু ছিল ফোর্ডনগর, কালামপুর, তালেবপুর ও ভোলাহাট শাখা।
- KGF-প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত উপকারভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে কেঁচো সার প্রশিক্ষণ অন্যতম। কেঁচো সার বিষয়ে ২ দিন করে ৫ ব্যাচ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ১২৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।

- KGF-প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত উপকারভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ অন্যতম। মৎস্য চাষ বিষয়ে ২ দিন করে মোট ৩ ব্যাচ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ৭৫ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।
- KGF প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত উপকারভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ অন্যতম। মৎস্য চাষ বিষয়ে ২ দিন করে মোট ৩ ব্যাচ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ৭৫ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।
- KGF প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত উপকারভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে সবজী চাষে ফেরোমন ফাঁদ প্রশিক্ষণ অন্যতম। সবজী চাষে ফেরোমন ফাঁদ বিষয়ে ২ দিন করে ১ ব্যাচ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ২৫ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।
- KGF প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত উপকারভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে বিষমুক্ত আম উৎপাদন প্রশিক্ষণ অন্যতম। বিষমুক্ত আম উৎপাদন বিষয়ে ১ দিন করে ৯ ব্যাচ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ২২৫ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।
- KGF- প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত উপকারভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে গবাদী পশুর আদর্শ বাসস্থান ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ অন্যতম। গবাদী পশুর আদর্শ বাসস্থান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১ দিন করে ৩ ব্যাচ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ২২৫ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।

আইসিটি এন্ড ইনোভেটিভ পার্টনারশিপস প্রকল্প

আইসিটি এন্ড ইনোভেটিভ পার্টনারশিপস প্রকল্প ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার ৩০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিমুলিয়া এসপি উচ্চ বিদ্যালয় তার মধ্যে একটি। কার্যক্রম শুরুর প্রারম্ভে স্কুল কর্তৃপক্ষের মনোভাব কিছুটা নেতিবাচক ছিল এবং আমাদের কাছে তারা স্কুলের উন্নয়নে দৃশ্যমান কিছু প্রত্যাশা করেছিল। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের শুরুতে একটি বেইজলাইন জরীপ করা হয়। যেখানে স্কুলের সার্বিক পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের খুব খারাপ চিত্র ফুটে উঠে। স্কুলের টয়লেট ছিল নোংরা, টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না, ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে কেউ মেনে চলত না, মেয়েদের মাসিককালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার কোন ধরনের ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকও ছিল না। ভার্ক বেইজলাইন জরীপের ফলাফল শেয়ার করার জন্য স্কুল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভায় জরীপের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। স্কুল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অনুধাবন করে অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে ওয়াশ অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। এই প্রকল্পের আওতায় স্কুল পর্যায়ে এনসিটিএফ নির্বাহী কমিটি গঠিত হয় এবং তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে দিনব্যাপী অরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। এনসিটিএফ সদস্যরা শিশু সনদ,

স্বাস্থ্যাভ্যাস অনুশীলন এবং শিশু গবেষণা বিষয়ক প্রশিক্ষণও নিয়েছে। এনসিটিএফ সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তার মধ্যে ওয়াল ম্যাগাজিন অন্যতম। একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গত অক্টোবর, ২০১৫-তে এনসিটিএফ সদস্যরা স্কুল ওয়াল ম্যাগাজিন তৈরি করেছে। যার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভার প্রতিফলন ও স্কুলের ওয়াশ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এনসিটিএফ সদস্যরা নিয়মিত ওয়াশ অবস্থা মনিটরিং করছে। এখন স্কুলের সার্বিক পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল।

-হেমন্ত কুমার মল্লিক
এলাকা সমন্বয়কারী
আইসিটি এন্ড ইনোভেটিভ পার্টনারশিপস প্রকল্প, ভার্ক

সিরাজগঞ্জে কমিউনিটির সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে শিখন প্রকল্পের ১৩টি স্কুল

প্রমত্তা ক্ষরস্রোতা ও পলি বিধৌত যমুনা নদীবেষ্টিত উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার সিরাজগঞ্জ জেলা ৯টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। জেলায় বসবাসকারী অধিকাংশ জনগণের মূল পেশা তাঁত ও কৃষি কাজ। প্রকৃতির খেয়াল খুশির উপর নির্ভরশীল নদী ভাঙ্গন ও চর এলাকায় বসবাসকারী জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান এখনও পশ্চাদপদ। জেলার বেশীরভাগ উপজেলা নদীবেষ্টিত ও চরাঞ্চল হওয়ার কারণে আধুনিক শিক্ষা, উন্নত প্রযুক্তির ধারা থেকে গ্রামে বসবাসকারী অধিকাংশ জনগণ এখনো অনেক পেছনে পড়ে আছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ও সমস্যা সমাধানে সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে এখনো সাময়িক প্রাপ্তি ও আনন্দটাই মুখ্য। সকল গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকা, অভিভাবকদের অসচেতনতা ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা হওয়ার কারণে প্রত্যন্ত এলাকার শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ কম।

আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্তকরণের জন্য ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) রাজশাহী অঞ্চলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায়, সেভ দ্য চলড্রেন-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা সুবিধা বঞ্চিত ও স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদের নিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাদানের জন্য সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি, কামারখন্দ ও রায়গঞ্জ ফিল্ড অফিসের আওতায় ৬টি উপজেলায় গত জানুয়ারি-২০১২ সাল থেকে ডিসেম্বর-২০১৫ সাল পর্যন্ত ৪৮ মাসব্যাপি শিখন কার্যক্রম সমাপ্ত করে। শুরুর দিকে সিরাজগঞ্জ জেলায় শিখন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যা সমাধান করে স্কুল পরিচালনা করা ছিল খুব চ্যালেঞ্জের। কমিউনিটি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ, উপজেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা প্রশাসন-সব ক্ষেত্রেই অসহযোগিতার মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।

জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রতিমাসে সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ, নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, জেলা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ উপজেলার বিভিন্ন কর্মকর্তার শিখন কর্মসূচি পরিদর্শনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে শিখন কর্মসূচি সম্পর্কে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। একইভাবে স্কুল পর্যায়ে কার্যকরী এসএমসি, সিএমসি,

অভিভাবক সমাবেশ, নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে শিখন কার্যক্রমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করানো সম্ভব হয়। শিখন কর্মসূচির মেয়াদকাল শেষে এসএমসি সদস্য/সিএমসি সদস্য, অভিভাবক, নিকটতম প্রাইমারি শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে শিখন প্রকল্প সমাপনী বিষয়ে সভার আয়োজন করা হয়। সে সকল সভায় কমিউনিটিকে বুঝানো হয় যে, শিখন কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকার শিশুদের লেখাপড়ার যে ধারা/সুফল চলমান আছে যা কর্মসূচির কার্যক্রম সমাপ্তির পরও আপনাদের সহযোগিতায় স্কুলটি আবার পরিচালিত হতে পারে। স্কুলটি পরিচালনার জন্য আপনাদের একজন দক্ষ শিক্ষক আছে, এলাকায় শিশু আছে, আপনাদের মাধ্যমে স্কুল পরিচালিত হলে শিখন স্কুলে ব্যবহৃত সকল শিক্ষা উপকরণও থাকবে। শুধু কমিটির উদ্যোগে অভিভাবকদের সহায়তায় শিক্ষিকার সম্মানী ও স্কুল ঘরের ব্যবস্থা করলেই স্কুলটি চলমান রাখা সম্ভব।

যার ফলশ্রুতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শিখন কর্মসূচি সমাপ্ত হলেও জনগণের অংশীদারিত্ব সৃষ্টিতে, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভার্ক-শিখন রাজশাহী অঞ্চলে শিখন মডালিটিতে পরিচালিত হচ্ছে ১৩টি স্কুল। কমিউনিটির মাধ্যমে পরিচালিত ১৩টি স্কুলে ৩৫৭ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। অভিভাবকরা প্রতিমাসে ৫০-১০০ টাকা দিয়ে শিক্ষিকার সম্মানী প্রদান ও কমিউনিটির মাধ্যমে স্কুল ঘর ভাড়া পরিশোধ করছে। সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক অফিস থেকে মাঝে মাঝে চলমান স্কুলগুলো পরিদর্শন করে উপস্থিতি, শিক্ষিকাদের মনোবল ও লেখাপড়ার গুণগতমান ধরে রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

কমিউনিটির সহায়তায় শিখন মডালিটিতে পরিচালিত কর্নসুতি পূর্বপাড়া স্কুলের শিক্ষিকা রোকেয়া বেগম বলেন, "গত ৪ বছর শিখন স্কুল পরিচালনা করেছি, এখন স্কুল ও শিশুদের ছাড়া আমি থাকতে পারি না। অভিভাবকদের আমি বলেছি, প্রয়োজনে আমাকে বেতন ও ঘর ভাড়া দিতে হবে না শুধু দয়া করে আমাকে শিশু দিবেন আমি লেখাপড়া শিখিয়ে দিব।"

যে কোন প্রতিষ্ঠানের মালিকানা জনগণ হলে এবং তার সুফল জনগণ পেলে টেকসই উন্নয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি পায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কমিউনিটির সহায়তায় শিখন মডালিটিতে পরিচালিত হচ্ছে ১৩টি স্কুল। স্কুল পরিদর্শন, অভিভাবক সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত আছে।

-মনমথ গোস্বামী, টিও (সিএম)
রাজশাহী অঞ্চল

উৎসব মুখর পরিবেশে উদযাপিত হল শিখন প্রকল্পের উপজেলা পর্যায় সাফল্য উদযাপন ও সমাপনী সভা

একটি ভাল বীজ থেকেই সম্ভব একটা গাছ মহীরুহ হয়ে ওঠা, তেমনি মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা জাতির ভবিষ্যত গঠন ও উন্নয়নে অপরিহার্য। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হল সেই দেশের সরকার। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সরকারের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। ভার্ক শিখন কর্মসূচি রাজশাহী অঞ্চলে শুরু থেকেই সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিখন কার্যক্রমের পরিকল্পনা, স্বচ্ছ জবাবদিহিতা, তথ্যের প্রবেশাধিকার ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সমাপনী পরীক্ষায় ঈর্ষান্বিত ফলাফল অর্জনের জন্য শিখন কর্মসূচি জেলা প্রশাসনসহ উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদের নিকট থেকে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে, সেভ দ্য চিলড্রেন-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) কর্তৃক বাস্তবায়িত শিখন কর্মসূচি রাজশাহী অঞ্চলে ৪টি জেলায় (সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা এবং নাটোর) জানুয়ারি-২০১২ সাল থেকে শিখন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এর মধ্যে গত ডিসেম্বর ২০১৫-তে বেলকুচি, কামারখন্দ ও রায়গঞ্জ শিখন ফিল্ড অফিসের মাধ্যমে ২৬৮টি শিখন স্কুল থেকে ৫৬১২ জন শিশু প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পাশের হার ৯৭.৫৬% এবং ১৭১টি শিখন কেন্দ্র থেকে ২য় শ্রেণির কোর্স

সমাপ্ত করে ৫০৪২ জন শিশুকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণিতে ভর্তি (ভর্তির হার ৯৯.৫৬) এবং ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় পাশ করা শিশুদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি করার মাধ্যমে ভার্কের শিখন প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের (কোহর্টের) সমাপ্তি হয়। শিখন কর্মীদের অত্যন্ত দক্ষতা ও সফল যোগাযোগের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা শিক্ষা অফিসকে শিখন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করার ফলেই শিখন কর্মসূচির সফল সমাপনী সম্ভব হয়েছে।

গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫ বেলকুচি, ১৭ জানুয়ারি ২০১৬ রায়গঞ্জ এবং ২০ জানুয়ারি ২০১৬ কামারখন্দ উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, প্রধান শিক্ষক, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এসএমসি সভাপতি (শিখন), শিখন স্কুলের শিশু, অভিভাবক, শিখন স্কুল শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক (স্থানীয়, জাতীয় প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া), ইমাম, এসসিআই প্রতিনিধি, শিখন আঞ্চলিক অফিস ও ফিল্ড অফিসের কর্মীবৃন্দের সমন্বয়ে উৎসব মুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হল উপজেলা পর্যায় সাফল্য উদ্‌যাপন ও সমাপনী সভা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মতামত:

- শিখন স্কুলের দক্ষ শিক্ষক আমাদের উপজেলার নাগরিক। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই দক্ষতাকে কাজে লাগাবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন (বেলকুচি, কামারখন্দ)।
- একটি শিশুও যেন প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝড়ে না পড়ে এবং সকল শিশুর বই নিশ্চিতকরণে সকলের কাজ করা উচিত (কামারখন্দ)।
- সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজ করার জন্য ও সকল সময় উপজেলা প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করায় দাতা সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন ও ভার্ক'কে ধন্যবাদ (কামারখন্দ, রায়গঞ্জ)।
- পুনরায় শিখন কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানান এবং সেভ দ্যা চিলড্রেন ও ভার্ক'কে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহায়তা করা হবে মর্মে আশ্বাস দেন (কামারখন্দ, রায়গঞ্জ)।
- শিখন আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম শুরু, সাফল্য উদ্‌যাপন ও সমাপনী সভার মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম শেষ করার জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, সেভ দ্য চিলড্রেন, ভার্ক'কে ধন্যবাদ জানান (বেলকুচি, কামারখন্দ, রায়গঞ্জ)।

- সেভ দ্য চিলড্রেন একটি লিডিং সংস্থা, খুবই ভালো মানের সংস্থা, ভার্কের কর্মীগণ অত্যন্ত দক্ষ। (রায়গঞ্জ)
- রায়গঞ্জ উপজেলায় ভার্ক-এর ফিল্ড অফিস থাকায় তিনি ভাগ্যবান মনে করেন এবং বলেন- রায়গঞ্জে অফিস থাকার কারণে হয়তো তদারকি বেশি হয়েছে এবং সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ শিখন শিশু পাস করেছে (রায়গঞ্জ)।
- শিখন প্রকল্পের উপকরণগুলো দেখেছি যা খুবই উন্নতমানের এবং শিশুদের শিখন উপযোগী (রায়গঞ্জ)।
- সরকারী প্রকল্প রক্স-এর সাথে শিখনের তুলনা করে বলেন, রক্স একটি আনহেলদি প্রকল্প, এখানে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে (রায়গঞ্জ)।

-মনমথ গোস্বামী
টিও (সিএম), রাজশাহী অঞ্চল

শিক্ষার মূল স্রোতধারার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে শেষ হল শিখন প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে (কোহর্টে) শিখনচক্র

শিখন স্কুল পরিদর্শনে মাননীয় সংসদ সদস্য:
শিখন স্কুলে শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করে প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার বৃদ্ধির জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে, সেভ দ্য চিলড্রেন-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) রাজশাহী অঞ্চলে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাদানের জন্য জানুয়ারি-২০১২ সাল থেকে ডিসেম্বর-২০১৫ সাল পর্যন্ত ১ম পর্যায়ে (কোহর্টে) বেলকুচি, কামারখন্দ ও রায়গঞ্জ শিখন ফিল্ড অফিসের মাধ্যমে ৪৮ মাসব্যাপি ২৬৮টি শিখন স্কুলে ৫৮২৭ জন শিশু এবং ১৭১টি শিখন কেন্দ্রে ৫০৪২ জন শিশুসহ মোট ১০,৮৬৯ জন শিশুকে নিয়ে ৪৩৯টি শিখন স্কুল পরিচালনা করেছে।

আরআরপিএম উপস্থিত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার:
৪৮ মাসব্যাপি শিখন স্কুলে অধ্যয়নরত শিশুদের প্রতি নতুন বছর সরকারে নিয়মাবলীর সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে এনসিটিবি নিশ্চিত করা, সরকারী প্রশ্নপত্রে সাময়িক পরীক্ষা, গ্রেড সমাপনী পরীক্ষা, ৫ম শ্রেণিতে ৩/৪টি মডেল টেস্টে অংশগ্রহণ, ডিআর করা, প্রবেশপত্র নিশ্চিত করা, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ফলাফল সংগ্রহ, সনদপত্র বিতরণসহ সকল কার্যক্রম শেষ করে ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় পাশ করা, ডিআর বহির্ভূত শিশুদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি এবং শিখন কেন্দ্রের শিশুকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে ২য় শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানো এবং উক্ত শিশু পাশ করার পর নিকটস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণিতে ভর্তি করানোর মত মহাযজ্ঞটি শিখন কর্মীরা সুন্দরভাবে সমাপ্ত করছে। শিখন কোর্স সমাপ্তির পর বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষার মূল ধারার সাথে সমন্বয় করার কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভার্ক রাজশাহী অঞ্চল প্রথম থেকেই কর্মসূচির কৌশলগত দিক

নির্ধারণ সাপেক্ষে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরী করে। ভার্ক রাজশাহী অঞ্চলে কর্মরত শিখন কর্মীদের কমিটমেন্ট দক্ষতা ও আন্তরিকতা ধাপে ধাপে সৃষ্ট সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে শিখন কর্মসূচির লক্ষিত উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়ন ঘটায়।

শিখন স্কুল: ভার্ক রাজশাহী অঞ্চলে ২৬৮টি শিখন স্কুল থেকে ৫,৮২৭ জন শিশুকে ডিআর করানো হয় যার মধ্যে ৫৬১২ জন শিশু প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ৫৪৭৫ জন শিশু প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাশ করে। পাশের হার ৯৭.৫৬%। ডিআরকৃত ৫৮২৭ জন শিশুর মধ্যে ৫৫৭৫ জনকে মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। ভর্তির হার ৯৫.৬৮ জন।

শিখন কেন্দ্র: ১৭১টি শিখন কেন্দ্র থেকে ২য় শ্রেণির কোর্স সমাপ্ত করে ৫০৪২ জন শিশু যাদের মধ্যে ৫০২০ জন শিশুকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। ভর্তির হার ৯৯.৫৬ জন।

সরকারের শিক্ষার মূল স্রোতধারার সাথে সমন্বয় করার জন্য শিখন রাজশাহী অঞ্চল যে সকল কৌশলগত দিক নির্ধারণ করেছিল তা নিম্নরূপ–

- জেলা ও উপজেলা পর্যয়ের প্রশাসনকে শিখন স্কুল পরিদর্শন করানো
- জন প্রতিনিধিদের (সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান) শিখন স্কুল পরিদর্শন করানো।
- বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় শিখন কর্মসূচির মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রম প্রচার
- জেলা ও উপজেলার এনজিও বিষয়ক মাসিক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ ও রিপোর্ট প্রদান

- উপজেলা পর্যায়ে প্রধান শিক্ষকদের সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ

শিখন স্কুল পরিদর্শনে উপজেলা শিক্ষা অফিসার

- সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে পরিচালিত ক্লাস্টার মিটিং-এ অংশগ্রহণ
- ক্যাচমেন্ট এলাকার প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে শিখন স্কুল পরিদর্শন করানো
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে সমাপনী পরীক্ষার প্রবেশপত্র বিতরণ করা
- এমটিটি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের মাধ্যমে সেশন পরিচালনা করানো
- এফআরপিএম ও আরআরপিএম-এ জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের অংশগ্রহণ করানো
- ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ
- ক্রোস ভিজিটের লার্নিং শেয়ার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পর্ক উন্নয়ন

কর্ম অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত এনজিও কর্মীদের সাথে সরকারী বিভিন্ন বিভাগের সাথে কাজের সমন্বয় থাকলে অনেক কঠিন কাজও সহজেই সমাধান করা সম্ভব।

-মনমথ গোস্বামী
টিও (সিএম), রাজশাহী অঞ্চল

সমাপনী পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করল শ্যামপুর শিখন স্কুল

"তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই"এই উক্তিটির সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন শ্যামপুর মিলপাড়ার শিখন স্কুলের শিক্ষিকা মোছাঃ আশিনুর আক্তার আঁখি। শিক্ষা বিস্তারে সমাজে অসামান্য ভূমিকা রেখে চলেছে গ্রামগঞ্জের অসংখ্য নারী। এদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষা বিস্তারে নিজেদেরকে নিবেদিতপ্রাণ করতে বদ্ধপরিকর। উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ পেলে তাঁরা তাঁদের সেই স্বপ্ন পূরণে হয়ে ওঠেন আত্মপ্রত্যয়ী। এমনই একজন আত্মপ্রত্যয়ী শ্যামপুর শিখন স্কুলের শিক্ষিকা আশিনুর আক্তার আঁখি! সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার দূর্গাপুর ইউনিয়নের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম শ্যামপুর। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। গ্রামটি এখনও আধুনিক জীবনযাত্রার মাপকাঠিতে পশ্চাদপদ। ছোটবেলা থেকেই সমাজের জন্য ভাল কাজ করার ইচ্ছা আশিনুরকে তাড়িত করে। সেই তাড়না থেকেই বিবাহের পরে স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে এলাকার দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেন। এভাবে অতিবাহিত হতে থাকে তার দিন। ২০১২ সালের কথা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে সেভ দ্য চিলড্রেন-এর কারিগরি সহায়তায় ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) কর্তৃক বাস্তবায়িত শিখন কর্মসূচি তার এলাকায় শিক্ষার উপর কাজ করবে জেনে তিনি এগিয়ে আসেন। তার সহায়তায় শিখন কর্মীরা শিশু জরিপ করে

৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শিখন স্কুল শুরু করেন। তার সংসারের যাবতীয় কাজ শেষ করে তিনি দক্ষতার সাথে স্কুল পরিচালনা করেন। প্রথম দিকে শিখন স্কুল পরিচালনা করতে গিয়ে পাঠদান কৌশল, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক কুসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে তাকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। তার দক্ষতা, আন্তরিকতা, পাঠদানের কৌশল এবং শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল দেখে গ্রামের অভিভাবকদের শিখন স্কুলের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। ২০১২ সালে আশিনুর ৩০ জন শিশু নিয়ে শিখনের প্রস্তুতিমূলক ক্লাস শুরু করে সফলতার সাথে একই শিশুদের বিভিন্ন শ্রেণিতে উত্তরণ ঘটান। বর্তমানে শ্যামপুর মিলপাড়া শিখন স্কুলে ৫ম শ্রেণিতে ৩০ জন শিশু ২০১৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৬ জন শিশু এ+ এবং ২৪ জন এ গ্রেড পেয়ে শতভাগ কৃতিত্বের সাথে পাশ করে শিশুরা সোনার হরিণটি ছিনিয়ে আনে।

আশিনুরের কাছে তার স্কুলের শিশুদের ভাল ফলাফলের কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান, "স্কুলের শুরুতেই আমি শিখনের বিভিন্ন পর্যায়ের ভাইদের দেয়া পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতাম। তাছাড়া আমি টিজিবি অনুসরণ করে স্কুলে পাঠদান করতাম, আমার স্কুলের এসএমসি সদস্যগণ দায়িত্বশীল ছিলেন। আমি আমার শিশুদের ভাল ফলাফলের জন্য স্কুল পরবর্তী সময়ে শিশুদের সহায়তা করতাম, দুর্বল শিশুদের চিহ্নিত করে বিশেষ সহায়তা দিতাম, নিয়মিতভাবে আমি আমার শিশুদের সাপ্তাহিক এবং মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতাম, আমি শিখন স্কুলের অভিভাবকদের নিয়ে অভিভাবক সভার মাধ্যমে মায়েদের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করেছি, আমার স্কুলে শিশু ড্রপ আউট কম ছিল, সরকারী স্কুলের মডেল টেস্ট পরীক্ষায় সরকারী স্কুলের শিশুদের সাথে আমার স্কুলের শিশুদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়েছি, সরকারী স্কুলের মডেল টেস্টের প্রশ্ন এবং শিখন প্রকল্পের রিসোর্স বুকের সাজেশন অনুসরণ করে আমি আমার শিশুদের নিয়মিত চর্চা করিয়েছি বিধায় আমার স্কুলের শিশুদের ভাল ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয়েছি"। তার অদম্য সাহস ও দৃঢ় মনোবল-এর ফলে আজকে শ্যামপুর মিলপাড়া শিখন স্কুলটি উল্লাপাড়া উপজেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাঙ্গনে একটি আলোচিত ও অনুকরণীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। সিরাজগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উল্লাপাড়া উপজেলার শিক্ষা বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা, সেভ দ্য চিলড্রেন, ভার্ক-এর প্রধান কার্যালয়ের প্রতিনিধিগণ স্কুলটি পরিদর্শন করেছেন।

গত ২০ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে কামারখন্দ ফিল্ড অফিস কর্তৃক আয়োজিত শিখন প্রকল্প সমাপনী ও সাফল্য উদ্‌যাপন সভায় অসাধারণ ফলাফল অর্জনের জন্য শ্যামপুর মিলপাড়া শিখন স্কুলের এ+ পাওয়া ৬ জন শিশুসহ উক্ত স্কুলের শিক্ষিকা আশিনুরকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সনদপত্র বিতরণ করেন এবং ভাল ফলাফলের জন্য প্রশংসা করেন।

আশিনুর আক্তার আঁখি বলেন, "শিখন কর্মসূচির মাধ্যমে আজ আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি। সমাজে আমাকে সবাই সম্মান করেন, এটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি"।

শিখন কর্মসূচি সমাপ্তির পরে আশিনুর স্বামীর কর্মস্থল কমলাপুর ঢাকায় চলে আসেন। শিশুদের শিক্ষা ছাড়া ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগে না আশিনুরের। তিনি লক্ষ্য করেন তার বাসার পাশেই একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুল, তিনি দেখতে যান সেটি এবং শিক্ষা বিষয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা প্রিন্সিপাল সাহেবকে বলেন। তার দক্ষতার বিষয়টি বিবেচনা করে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে মাদারটেক শবনম আইডিয়াল কিন্ডার গার্টেন স্কুলে শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োগ দেন এবং তাকে এক মাসের প্রশিক্ষণ লাগবে বলে জানান। আশিনুরের ক্লাস পরিচালনার দক্ষতা বিবেচনা করে কয়েকদিন পরই তাকে প্রশিক্ষণ লাগবে না বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানান। শিখন স্কুলের পাঠদানের কৌশল ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বর্তমানে আশিনুর আক্তার আঁখি মাদারটেক শবনম আইডিয়াল কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শিক্ষিকা যা শিখন কর্মসূচিরই ফল।

আমাদের সমাজে এ ধরনের অনেক স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষ আছেন যারা তাদের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই আমাদের সমাজ সুন্দরভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। শ্যামপুর শিখন স্কুলের শিক্ষিকা আশিনুরও তাঁদের মধ্যে একজন।

প্রতিবেদক
-মনমথ গোস্বামী
টিও-সিএম ভার্ক-সিরাজগঞ্জ

দিবস উদ্‌যাপন

যাদের মহান আত্মত্যাগে একুশ পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি সেই সকল নির্ভীক ভাষা সৈনিকদের প্রতি ভার্ক ও সাভার উপজেলা এনজিও সমন্বয় পরিষদ-এর শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন।

বাঙালিজাতির জীবনে অনন্য দিন আজ। আজ ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এ দিবস উদ্‌যাপনে সাভার উপজেলা সমন্বয় পরিষদ জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন।

সাফল্য গাঁথা

জীবন সংগ্রামে লনী রানীর সফলতার গল্প

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার মুন্দিরপুর গ্রামের অধিবাসী লনী রানী। চার ভাই ও দুই বোনের মধ্যে লনী রানী ছিলেন মেঝো। মাত্র ১৬ বছর বয়সে লনীর বিয়ে হয় একই গ্রামের অনিল কুমারের সাথে। অনিল কুমারের পেশা ছিল মাটির হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করা। শুধুমাত্র হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করে এবং তা বিক্রি করে ক্ষুধার অন্ন জুটানো ছাড়া লনী রানীর স্বামীর পক্ষে আর অনেক মৌলিক চাহিদাই পূরণ করা সম্ভব ছিল না। লনী রানী জীর্ণ ছনের ঘরে কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকতেন ৫ ছেলেমেয়ে এবং স্বামীকে নিয়ে। এভাবেই চলে যায় বিয়ের ১৬টি বছর। তাদের ছেলে-মেয়েরা বড় হতে থাকে। সংসারের ব্যয় ভারও বাড়তে থাকে। অভাবের কারণে ছেলে-মেয়েদের তেমন লেখাপড়া করাতে পারেন নি লনী। এই অবস্থায় লনী রানী প্রতিবেশির কাছ থেকে শীতল পাটি বানানোর কাজ শিখে নেন এবং এই কাজে পুঁজির জন্য ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)-এর জামপুর শাখার ফিল্ড সুপারভাইজারের সাথে যোগাযোগ করে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হন। প্রথম দফায় লনী রানী সংস্থা হতে ১৫,০০০/= টাকা, দ্বিতীয় দফায় ২০,০০০/= টাকা এবং সর্বশেষ দফায় ১,৪০,০০০/= টাকা ঋণ নেন। সততা ও পণ্যের উন্নতমানের কারণে বিভিন্ন এলাকার লোকজন তার কাছ থেকে মালামাল ক্রয় করে থাকেন। গড়ে প্রতি সপ্তাহে তিনি ৫০-৬০টি শীতলপাটি তৈরি করেন এবং এর প্রতিটি শীতলপাটি বিক্রি করেন ২৫০ থেকে ৫০০ টাকা দরে। এতে সপ্তাহে ১২,০০০/= টাকার শীতলপাটি বিক্রি হয় এবং শীতল পাটি তৈরিতে খরচ হয় মাত্র ৫,০০০ টাকা। ফলে লাভ থাকে প্রতি সপ্তাহে ৭,০০০/= টাকা। সংসারের খরচ চালানোর পরও তাঁর কিছু সঞ্চয় হয়। এই টাকা বিনিয়োগ করে বর্গা জমিতে কৃষি কাজ করেন এবং কোরবানীর ঈদের ছয় মাস আগে গরু কিনে লালন পালন করে তা বিক্রি করে অতিরিক্ত আয় করতে থাকেন। লনী রানী বুদ্ধিমতি ও সচেতন নারী। সংসারে খরচ কমিয়ে নিজের স্বাদ-আহলাদ বাদ দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করেন কিছু টাকা সঞ্চয় করতে। এক পর্যায়ে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে তিনি নিজের বাড়িতে একটি স্যানেটারী ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল স্থাপন করেন। সেই সাথে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেন। তিনি বলেন, সমিতির ঋণের টাকা যদি পরিকল্পনা মাফিক ও সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় অবশ্যই উন্নতি আসবে। তাঁর মতে সমিতি থেকে ঋণ নেয়া আর অন্য কোথা থেকে টাকা ধার নেয়া এক কথা নয়। বিশেষ করে সমিতিতে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক বিষয়গুলো যেভাবে আলোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

লনী রানী প্রতিবেশির কাছ থেকে শীতল পাটি বানোনোর কাজ শিখে নেন এবং এই কাজে পুঁজির জন্য ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)-এর জামপুর শাখার ফিল্ড সুপারভাইজারের সাথে যোগাযোগ করে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হন। প্রথম দফায় লনী রানী সংস্থা হতে ১৫,০০০ টাকা, দ্বিতীয় দফায় ২০,০০০ টাকা এবং সর্বশেষ দফায় ১,৪০,০০০ টাকা ঋণ নেন। সততা ও পণ্যের উন্নতমানের কারণে বিভিন্ন এলাকার লোকজন তার কাছ থেকে মালামাল ক্রয় করে থাকেন।

পরিবারের সকলের সম্মিলিত পরিশ্রমের ফলে আজ লনী রানীর বাড়িতে পাকা ঘর তৈরি হয়েছে এবং ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরি করেছেন। অর্থনৈতিক সচ্ছলতার কারণে পরিবার এবং সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখে আছি। বর্তমানে তাঁর ৪ বিঘা জমি, ৫ ভরি স্বর্ণের অলংকার, ১টি গাভী এবং ২টি ষাঁড় রয়েছে। লনী রানীর পরিবার বর্তমানে খাওয়া ও সকল কাজে নলকূপের বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করেন। চিকিৎসার জন্য এখন শুধু কবিরাজ ও বনজ ঔষধের উপর নির্ভর না করে ক্লিনিক বা হাসপাতালে যান। সংসারের যে কোন সিদ্ধান্ত তাঁর পরামর্শ মতো গ্রহণ করা হয়। সমাজের সকলের সাথে তাঁর ভালো সম্পর্ক রয়েছে। লনী রানী সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করেন ফলে সমাজের লোকজনও তাঁর কাছে বিভিন্ন পরামর্শের জন্য আসে। সংসার ও সমাজে আজ তিনি এক ক্ষমতায়িত নারী।

সংগ্রহে: আইবিআইজি সেকশন
ভার্ক থেকে প্রকাশিত

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন প্রতিবেদন-২০১৬

অধিকার, মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান এই শ্লোগানকে সামনে রেখে সাভারে নানা আয়োজনে পালিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। উপজেলা প্রশাসন-এর উদ্যোগে এবং এনজিও সমন্বয় পরিষদ-এর সহযোগিতায় র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রথমে উপজেলা চত্বরে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। মাননীয় সংসদ সদস্য ডা. এনামুর রহমান-এর নেতৃত্বে সাভার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ জুবায়ের, উপজেলার সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষক ও স্কুল কলেজ-এর ছাত্রছাত্রীবৃন্দসহ প্রায় ৩ শতাধিক লোক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। র‍্যালিটি উপজেলা চত্বর থেকে শুরু করে সাভার পৌর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে আনন্দপুর ভার্ক অফিসে এসে শেষ হয়। র‍্যালিটি ব্যানার ফেস্টুন, মাইক, প্ল্যাকার্ড ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত করা হয়। র‍্যালির শ্লোগান ছিল- আন্তর্জাতিক নারী দিবস- সফল হউক, সফল হউক, পারিবারিক নির্যাতন- বন্ধ কর, বন্ধ কর, বাল্য বিবাহ- বন্ধ কর, বন্ধ কর, সকল কাজে নারীর মতামত- নিতে হবে নিতে হবে, নারী শিক্ষার সকল সুযোগ- দিতে হবে, দিতে হবে ও কাজে কোন ভাগ নাই, নারী পুরুষ সমান তাই।

আলোচনা সভা:

আলোচনা সভায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ জুবায়ের-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- ঢাকা-১৯ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ডা. মোঃ এনামুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-সাভার উপজেলা পরিষদ-এর প্যানেল চেয়ারম্যান মোঃ পারভেজ দেওয়ান, ভার্ক-এর নির্বাহী পরিচালক শেখ আবদুল হালিম, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা খালেদা আক্তার জাহান, উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির সভাপতি মিসেস রোকেয়া হক, এডাব ঢাকা জেলা শাখার সভাপতি মোঃ ইয়াকুব হোসেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ-এর সাভার শাখার সভানেত্রী পারভীন ইসলাম, সেভ দ্য চিলড্রেন-এর সিনিয়র ম্যানেজার সৈয়দ মতিউল আহসান ও টিআইবি-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার সমাপিকা হালদার। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ভার্কের প্রজেক্ট ম্যানেজার বাবুল মোড়ল।

এ সময় আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীদের আলোচনা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশমালা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন।
২. পারিবারিক সুরক্ষা আইন-২০১০ বাস্তবায়ন।
৩. প্রান্তিক পর্যায়ে নারীর স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধিকরণ।
৪. নারীর প্রতি পুরুষদের মানসিকতার পরিবর্তন।
৫. নারীদের সমস্যা সমাধানের জন্য সাভারে মনিটরিং সেল গঠন করা।

এছাড়া আলোচনায় বক্তারা নারী দিবসের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্ক শহরের সেলাই কারখানার নারী শ্রমিকদের অমানবিক ও বিপজ্জনক কর্মপরিবেশ, দৈনিক বারো ঘন্টা কাজ ও স্বল্প মজুরীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্নমুখী নারী অধিকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতাকে কেন্দ্র করে ১৯১০ সালে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে গঠিত হয় নারীর মর্যাদা কমিশন। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ হিসেবে ঘোষণা দেয়। নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য দূর করার জন্য ১৯৭৯ সালে ৩০ ধারার সিডও সনদ ঘোষণা করে। ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্মেলনে নারী ও শিশু অধিকার মানবাধিকারের

অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে নারীর অসমতা দূরীকরণে গৃহীত সনদগুলোর মধ্যে-বিবাহিত নারীর জাতীয়তা সংক্রান্ত সনদ; বিবাহের সম্মতি, বিবাহের ন্যূনতম বয়স সীমা এবং রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সনদ; দাসত্ব থেকে মুক্তি সংক্রান্ত সনদ উল্লেখযোগ্য। এ সকল সনদ এবং নারী অধিকার সংগঠনগুলোর ক্রমাগত উদ্যোগের ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯৭৯ সালে গৃহীত হয় **"নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ" যা 'সিডও'-CEDAW** সনদ নামে পরিচিত।

আজকের নারী আন্দোলন:

আজ থেকে ১২০ বছর পূর্বে বেগম রোকেয়া অনুভব করেছিলেন নারীর এ অন্তর্দহন। ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে রাহাতুন্নেছা সাবেরা চৌধুরানী আর জহির উদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবেরের ঘর আলো করে এলো এক আলোকবর্তিকা। তাঁর নাম রাখা হলো রোকেয়া খাতুন। তৎকালীন অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত-বংশীয় পরিবারে লেখাপড়া করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, তবে তা কেবল মাত্র পুরুষদের জন্য। কিন্তু কি এক অদ্ভুত কারণে এ মেয়েটি শিশুকাল থেকেই লেখাপড়ার প্রতি অদম্য টান অনুভব করত। তাই মাত্র পাঁচ বছর বয়সে বড় বোন করিমুন্নেছার কাছ থেকে বাংলা ও ইউরোপিয়ান গভর্নেসের কাছ থেকে ইংরেজী শিখতে শুরু করে রোকেয়া। ব্যক্তি জীবনে বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার অন্তরায়কে দেখেছিলেন অত্যন্ত কাছ থেকে। অনির্বাণ আলোর শিখা হাতে নিয়ে যিনি পৃথিবীর মানুষকে জাগানোর ব্রত নিয়ে জন্মেছেন তাঁর নাম বেগম রোকেয়া। পথ পরিক্রমার এক পর্যায়ে রোকেয়া বুঝতে পারলেন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা অর্জন এবং ক্ষমতায়নের জন্য নারীকে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতায় সাবলীল হতে হবে। শুরু হলো বেগম রোকেয়ার নারী জাগরণের সংগ্রামী প্রচেষ্টা। রোকেয়া বলেছিলেন, **"কন্যাগুলোকে সুশিক্ষিত করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, দেখিবে নিজের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান নিজেই করিয়া লইবে।"**

আলোচনা সভা শেষে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

-বাবুল মোড়ল, প্রজেক্ট ম্যানেজার, ভার্ক

অবরোধ বাসিনী
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

আমরা বহুকাল হইতে অবরোধ থাকিয়া থাকিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি সুতরাং অবরোধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের-বিশেষত: আমার কিছুই নাই। মেছোনীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "পঁচা মাছের দুর্গন্ধ ভাল না মন্দ?" - সে কি উত্তর দিবে?

বিবাহিতা নারীগণও বাজীকর-ভানুমতী ইত্যাদি তামাশাওয়ালী স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে পর্দা করিয়া থাকেন। যিনি যত বেশী পর্দা করিয়া গৃহকোণে যত বেশী পেঁচকের মত লুকাইয়া থাকিতে পারে, তিনিই তত বেশী শরীফ।

হতাশা থেকে আশা

পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রসূত খরাজনিত সমস্যা মোকাবেলায় জন-সামর্থ্য বৃদ্ধি ("Community Capacity building to Face Challenges of Drought as an effect of Climate Change (CBFDCC) Project") নামক একটি প্রকল্প নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার চারটি ইউনিয়নে ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে- নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সামর্থ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন হিসেবে খরাজনিত সমস্যা মোকাবেলা করা।

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় হাজীনগর ইউনিয়নে শাবইল নক্সাপুকুর গ্রামে মোছা: আলেয়া বেওয়া-র বাড়ি। আলেয়ার জীবনে সব সময় হতাশা আর নিরাশায় সময় কাটতো। খুঁজে পায় না সুখের আশা কারণ তার স্বামী ছিল সংসারের মূল হাতিয়ার। সেই স্বামীর মৃত্যুর পর তার সব আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তার পরিবারে সাতজন সদস্য নিয়ে কোন রকমে জীবন-যাপন করেন। এমতাবস্থায় বাঁচার তাগিদে তিনি একটি ছাগল আদি নিয়ে থাকার কুঁড়ে ঘরে লালন-পালন করতে আরম্ভ করলেন এবং অন্যের বাড়িতে কাজ করে কোন রকমে দিনাতিপাত করতে থাকেন। অতঃপর তিনি থাকার কুঁড়ে ঘরের সাথে বেড়া দিয়ে একত্রে ছাগল, হাঁস ও মুরগী পালন করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু একসাথে রাখার কারণে সব সময় ঘর নোংড়া থাকার ফলে রোগ-বালাই লেগেই থাকত। অজ্ঞতার কারণে ভাল পরিবেশ ও রোগ প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা চিন্তাও করতে পারেন নাই।

ভার্ক সিসিসিপি প্রকল্পে- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবেলা দলে অন্তর্ভুক্তি হওয়ার পর থেকেই তিনি নিয়মিত দলীয় সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সমস্যা মোকাবিলা বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনমূলক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে ছাগলের মাঁচার জন্য আবেদন করেন এবং ভার্ক প্রতিনিধি তার বাড়ি পরিদর্শন করে সিসিসিপি-র নীতিমালা অনুযায়ী তার বাড়ির আঙিনায় মাঁচা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর অক্টোবর, ১৫ তারিখে তাকে ছাগল/ভেড়া পালনের উপর দুইদিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং সে অনুযায়ী হাঁস-মুরগী, ছাগল লালন পালন করতে থাকেন। পরবর্তীতে ২টি ছাগল ১৩,০০০/= বিক্রি করে ও আরো ১০,০০০/= টাকা দিয়ে ১৬ শতক জমি কট বন্ধক নিয়ে ফসল উৎপাদন শুরু করেন। বর্তমানে মোছা: আলেয়া বেওয়ার মাঁচায় ৮টি ছাগল ও কুঠি ভরা হাঁস-মুরগী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে পালন করছেন। নিয়মিত রোগ বালাইয়ের প্রতিষেধক ও চিকিৎসা করাতে পারছেন। অভাব অনটনও আগের মত নেই, সবসময় সুস্থ পরিবেশ বজায় আছে। এজন্য সিসিসিপি প্রকল্প তথা ভার্ক-এর প্রতি সে কৃতজ্ঞ।

ছাগলের পরিচর্যা করছেন মোছা: আলেয়া বেওয়া

গ্রামটি ফিরে পেয়েছে তার প্রাণ

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ-এর বাস্তবায়নাধীন ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার ভার্ক-এর সহযোগিতায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রসূত খরাজনিত সমস্যা মোকাবেলায় জন-সামর্থ্য বৃদ্ধি (Community Capacity Building to Face challenges of Drought as an Effecte of Climate Change) নামক একটি প্রকল্প নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ০৪ (চার)টি ইউনিয়ন (হাজীনগর, চন্দননগর, রসুলপুর ও বাহাদুরপুর) বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন প্রসূত খরাজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে অভিযোজন হিসাবে লক্ষিত কমিউনিটির সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খরা এবং অন্যান্য দূর্যোগ-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে কমিউনিটির সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং অভিযোজন হিসাবে যথাযথ খরাজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ৮নং বাহাদুরপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের আঘোর মৌজার প্রান্তিক ও দুর্গম একটি পাড়া একডালিয়া। সেখানে বসবাসরত ৫৩ (তিপ্পান্ন)টি পরিবার।

সেখানে প্রায় সবাই অশিক্ষিত দিন মজুর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সেখানে পাড়ার পাশে একটি মজা পুকুর ছিল। খরা মৌসুমে হাঁটুর নিচে পানি থাকে। যা গোসলসহ গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এতে করে সেখানকার জনগণ প্রায়ই পানি সংকটজনিত দুর্ভোগ পোহাতে হতো এবং পাড়ায় তেমন কোন গাছপালা না থাকায় চৈত্রের সূর্য্যের তাপ যেন বসবাসের পরিবেশ কেড়ে নিয়েছিল। এ জন্য তারা আর্থ-সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এমন সময়ই বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ-এর বাস্তবায়নাধীন ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার ভার্ক-এর সহযোগিতায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রসূত খরাজনিত সমস্যা মোকাবেলায় জন-সামর্থ্য বৃদ্ধি প্রকল্পে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনা দল একডালিয়ায় ১৬.০৯.২০১৪ইং তারিখে গঠন হওয়ার পর থেকেই নিয়মিত দলীয় সভায় সবাই অংশগ্রহণ করেন এবং জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, খরাজনিত সমস্যা মোকাবিলা, বৃক্ষ রোপণ, বসত ভিটায় সবজি চাষ, আয়বর্ধকমূলক কর্মসূচী, নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা স্থাপন, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ, পুকুর পুনঃখনন, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্বাস্থ্যাভ্যাস সংক্রান্তসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে। পাড়ার উপকারভোগীগণ যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে পুকুর পুনঃখনন-এর সুবিধার কথা ভেবে ভার্ক প্রতিনিধিদের অবগত করেন এবং ভার্ক প্রতিনিধিগণ এলাকা পরিদর্শন করে পুকুরটি পুনঃখনন-এর জন্য উপযোগী বলে জানান। কিন্তু পুকুরটি খাস বিধায় তা পুনঃখনন-এর জন্য সহকারী কমিশনার ভূমি-এর অনুমোদন প্রয়োজন হবে। ভার্ক কর্তৃপক্ষ উপজেলা সমন্বয় সভায় ৭-৯-২০১৫ইং তারিখে তা উপস্থাপন করলে উপজেলা পরিষদ সকল দিক বিবেচনা করে পুকুর পুনঃখনন-এর জন্য উপজেলা সমন্বয় কমিটি মিটিংয়ে তা আলোচনা হয় ও একমত হয় যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে পানির উপর। অসংখ্য খাল, বিল, পুকুর ও জলাশয়ের পানির প্রাপ্যতা প্রধানত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। এলাকায় শুকনো মৌসুমে পানির সংকট প্রকট আকার ধারন করে। পুকুর পুনঃখনন ও এর সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। সার্বিক দিক বিবেচনা করে স্থানীয় সংসদ সদস্যের উপস্থিতিতে উপজেলা সমন্বয় কমিটি মিটিংয়ে পুকুর পুনঃখনন করার জন্য ভার্ক'কে অনুরোধ ও অনুমোদন দেয়া হয়। উপকারভোগীগণ ১১-১১-২০১৫ইং তারিখে ভার্ক বরাবর আবেদন জানান সিসিসিপি-এর নীতিমালা অনুযায়ী উপকারভোগীদের সুবিধাসহ সকল দিক বিবেচনা করে মৌজা আঘোর, হাল দাগ নং ৩১৩, খতিয়ান নং ০১, জমির পরিমাণ: ৬০ শতাংশ এবং জমির ধরন: খাস (সরকারী) পুকুর পুনঃখনন-এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ২৮-০২-২০১৬ইং তারিখে তা বাস্তবায়ন হয়। পুকুর পুনঃখনন-এর পর চার পাড়ে মোট ৫০০ (পাঁচশত)টি নিম গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে এবং রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য পাড়ের চারদিকে বাঁশ দ্বারা বেড়া দেয়া হয়েছে। নিম গাছের চারাগুলো বেড়ে তরতাজা ও সজীব হয়েছে। পুকুর বৃষ্টির পানিতে কানায় কানায় ভরে গেছে। এখন পুকুর ব্যবস্থাপনা কমিটি সহ সকল উপকারভোগী পরিবারগুলো পুনঃখননকৃত পুকুরটি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে। তারা জুলাই, ২০১৬ইং সময়ে পুনঃখননকৃত পুকুরটিতে ১৫ (পনের) কেজি (প্রতি কেজিতে গড়ে ৩৫টি) পোনা মাছ (বাজার

মূল্য=১,৯৫০/-) ছেড়েছিলেন এবং প্রাকৃতিকভাবে চাষ করে বর্তমানে একেকটি মাছের ওজন প্রায় এক কেজি থেকে এক কেজি দুই-তিনশত গ্রাম হয়েছে। বর্তমানে ডিসেম্বর, ২০১৬ ইং সময়ে ৫০০ কেজি মাছের আনুমানিক বাজার মূল্য ৭৫,০০০/= (পঁচাত্তর হাজার) টাকা। অন্য কোন খরচ না থাকায় ছয় মাসে নীট মুনাফা ৭৩,০০০/= (তিহাত্তর হাজার)। পুকুর পুনঃখনন, পুকুর পাড়ে বৃক্ষরোপণ ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ-এর জন্য এখন তারা বসবাস উপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশ ফিরে পেয়েছে। উপকারভোগী পরিবারের সদস্যগুলো সুস্থ আছে এবং আর্থিকভাবে তারা লাভবান হচ্ছে। এ জন্য তারা সিসিসিপি ও ভার্ক-এর প্রতি কৃতজ্ঞ।

নিরাপদ পানির জন্য সারথীর সংগ্রাম

পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রসূত খরা জনিত সমস্যা মোকাবেলায় জন-সামর্থ্য বৃদ্ধি (“Community Capacity building to Face Challenges of Drought as an effect of Climate Change (CBFDCC) Project”) নামক একটি প্রকল্প নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার চারটি ইউনিয়নে ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে-নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সামর্থ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন হিসেবে খরাজনিত সমস্যা মোকাবেলা করা।

নলকূপের পরিচর্যা করছেন সারথী রানী

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় হাজীনগর ইউনিয়নে হাজীনগর উত্তরপাড়া গ্রামের শ্রীমতি সারথী রানী-এর বাড়ী। শুরু থেকেই তার পরিবারে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা লেগেই ছিল। ভূমিহীন পরিবারে তার বিয়ে হয়। তার স্বামী জগদীশ বর্মণ (৬২) মাঠে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে। তার পরিবারে দুই মেয়েকে বিয়ে দেয়ার পর তারা স্বামীর বাড়ি চলে গেছে। সারথীর খুব কষ্ট, অন্য পাড়া থেকে পানি বহন করে আনতে হয়, পাড়ায় কোন নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নাই। পাড়ার সকলে অতিদরিদ্র হওয়ায় নলকূপ স্থাপন করা তাদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়। রাতের অন্ধকারে যখন পানির প্রয়োজন হয় তখন সকল বাধা উপেক্ষা করে অন্য পাড়া থেকে পানি বহন করে আনতে হয়। বর্ষাকালে রাস্তায় হাঁটু পরিমাণ কাঁদা জমে থাকে, উপায়ান্তর না থাকায় দূর্ভোগের মধ্যেই পানি আনতে হয়। বেশির ভাগ সময় পুকুরের পানি দিয়ে রান্নার কাজ করতে হয়। নিরাপদ পানি না থাকার কারণে সাংসারিক সকল কাজে পুকুরের পানি ব্যবহার করার ফলে অসুখ বিসুখ হয়েছিল তার নিত্যসঙ্গী।

ভার্ক সিসিসিপি প্রকল্পে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দলে অন্তর্ভুক্তি হওয়ার পর থেকেই তিনি নিয়মিতভাবে দলীয় সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং জলবায়ু পরিবর্তন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সমস্যা মোকাবিলা বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনমূলক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পাড়ার ৮টি পরিবার মিলে একটি নলকূপ স্থাপন করার জন্য দলীয় সভায় আলোচনা হয় ও সারথীর বাড়ির আঙ্গিনায় স্থান নির্ধারণ করা হয়। তাদের জুলাই, ২০১৫ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে আগস্ট, ২০১৫ তারিখে নলকূপ স্থাপন করা হয়।

বর্তমানে সারথীর বাড়িতে স্থাপিত নলকূপ সকলে মিলে যত্ন, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। সারথি অন্যান্য কেয়ারটেকারদের মতো নলকূপ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে কেয়ারটেকার ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন। ছোটখাট কোন সমস্যা দেখা দিলে তিনি তা সমাধান করতে পারছেন। সারথিসহ পাড়ার সকলে গৃহস্থালি ও অন্যান্য সকল কাজে নলকূপের পানি ব্যবহার করছেন। নিরাপদ পানি হাতের নাগালের মধ্যে থাকায় অসুখ বিসুখ আর আগের মতো নেই। নিরাপদ পানির জন্য সারথীর জীবন সংগ্রামে সে সফল হয়। এজন্য সিসিসিপি প্রকল্প তথা ভার্ক এর প্রতি সে কৃতজ্ঞ।

মুহিপাড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা

অনেক প্রতীক্ষার অবসান হল। যুগ যুগ ধরে যারা অনেক কষ্ট করে বহুদূর পথ বেয়ে পানি সংগ্রহ করে নিজেদের খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল। তারা অবশেষে নিজেদের বাড়িতে নিরাপদ পানির স্বাদ পেয়েছে। এখন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কয়েকশ’ মানুষ নিরাপদ পানি পাওয়ায় তাদের মধ্যে অপরিসীম আনন্দ আর প্রাপ্তির উল্লাস। পিছিয়ে পড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অর্ধশতাধিকেরও বেশি পরিবার এখন থেকে ওভারহেড ট্যাংকের মাধ্যমে পাইপ লাইন সাপ্লাই সিস্টেম পদ্ধতিতে নিরাপদ পানি পান ও ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে। আর এ কাজটি করা হয়েছে ওয়াটার এইডের সহযোগিতায় ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)-এ প্রকল্প

বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে গত ২মে ২০১৬ দুর্গাপুর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আক্তারুন্নাহার এই সাপ্লাই সিস্টেম উদ্বোধন করেন। এ সময় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে আনন্দ আর পাওয়ার সুখ অন্যরকম পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় ক্যাথলিক মিশনের ফাদার বানাড রোজারিও সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভার্ক উত্তর অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জনাব তপন কুমার সাহা দুর্গাপুর এলাকার রুরাল ওয়াশ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক আহমেদ ওমর ফারুক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, সিবিও কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ওয়াটার এইডের সহযোগিতায় ৫ লাখ ১৬ হাজার ৫১৯ টাকা ব্যয়ে ভার্ক এনজিও এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। পাইপ লাইনের মাধ্যমে মুহিপাড়া মিশনের বরেন্দ্র প্রকল্প হতে পানি সংগ্রহ করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্মিত ট্যাঙ্কিতে পানি মজুদ করা হয়। সেখানে থেকে সাপ্লাই লাইনের মাধ্যমে প্লাটফর্ম করে ট্যাপের মাধ্যমে লোকজন পানি খাওয়াসহ ব্যবহারের জন্য নিয়ে থাকে। দুর্গাপুর উপজেলা সড়কের প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে দুর্গম আদিবাসী অধ্যুষিত পাড়ায় এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পাড়ায় ৭৯ পরিবারের কয়েকশ মানুষ নিরাপদ পানি পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এর আগে স্থানীয় লোকজন অনেক দূর থেকে বিশেষ করে খাবারের পানি সংগ্রহ করত। এতে তাদের প্রচুর সময় লেগে যেত। এ ছাড়া রান্নাবান্নার কাজের জন্য তারা নিকটবর্তী মজা নদী, পুকুর থেকে পানি নিয়ে আসত। অনেকদূ পথ পাড়ি দিয়ে তাদের গোসল করতে যেতে হতো। এ দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে দুর্গম এই পাড়ায় সাপ্লাই সিষ্টেম পদ্ধতির মাধ্যমে পানি মজুদ করায় স্থানীয় লোকজন এখন এ পানি

খাওয়া, রান্না-বান্নাসহ নিত্য ব্যবহার্য কাজে ব্যবহার করতে পারছে। পাইপ লাইন সিষ্টেম ব্যবস্থাপনার সকল দায়িত্ব স্থানীয় ক্যাথলিক মিশন পালন করবে বলে মিশনের ফাদার বানাড রোজারিও এ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন দুর্গম আদিবাসী পাড়ায় জনসাধারণের দুর্বিসহ পানি যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এনজিও সংস্থা ভার্কের প্রশংসা করেন। এতে করে আদিবাসী পাড়ায় নিরাপদ পানির নিশ্চয়তা পেয়েছে। তিনি বলেন, মানুষের খাদ্য সমস্যা থেকে পানির সমস্যা অনেক বেশি, দুর্গম এলাকায় নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান আরো একধাপ এগিয়ে গেছে, এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আগামীতে অন্যান্য এনজিও যদি এভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে করে তাহলে দুর্গাপুরে আর নিরাপদ পানি সংকট থাকবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অভাবকে জয় করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন দেলোয়ারা বেগম

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার ফোর্ডনগর গ্রামে দেলোয়ারা বেগমের বাস। গরীব পিতা লেখাপড়া করাতে পারেননি তাই অল্প বয়সেই বিয়ে হয় দেলোয়ারার। বিয়ের প্রথম বছরেই তার কোল জুড়ে আসে আদরের সন্তান। অভাবী দেলোয়ারা একমাত্র সন্তানকে রেখে স্বামীর সাথে অন্যের ফুল বাগানে কাজ করেন। সন্তান বুবেলের বয়স যখন এক বছর, অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্নতার কারণে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় দেলোয়ারার সন্তান। কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না দেলোয়ারা। সম্বল মাত্র ভিটেমাটি সহকারে পাঁচ শতাংশ চাষাবাদের জমি। স্বামীর সাথে পরা করে তিন শতাংশ চাষাবাদের জমি পাঁচ হাজার টাকায় বন্ধক রেখে সন্তানকে ঢাকায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় এবং সারিয়ে তুলেন।

গ্রামে ফিরে এলে তারা আবার অন্যের ফুল বাগানে কাজ শুরু করেন। বন্ধকী জমি ছাড়ানোর জন্য টাকার দরকার কিন্তু টাকা পাবে কোথায় এই সকল চিন্তা করে জীবন আর এগোয় না। এক এক করে ৫ সন্তানের জননী হয়েছেন দেলোয়ারা বেগম। একসময় দেলোয়ারা মনে করেন তাঁর বাবার বাড়ি পাড়ি জমাবেন। কিন্তু সন্তানদের আর স্বামীকে রেখে তিনি এগুতে পারলেন না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যেভাবেই হোক নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবেন। তাই দু'জনে মিলে সিংগাইর এলাকার ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)-এর শাখা ব্যবস্থাপকের সাথে কথা বলে সংস্থার নিয়ম কানুন জেনে বাড়িতে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন দেলোয়ারা ভার্ক সমিতির সদস্য হবেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক মহানন্দা সমিতিতে ভর্তি হন এবং নিয়মিত ১০ টাকা করে সঞ্চয় দিতে শুরু করেন। প্রথম দফায় দেলোয়ারা ১৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা দিয়ে বন্ধকী জমি ছাড়িয়ে আনেন এবং বাকী টাকা দিয়ে তারা ধানের বীজ কিনে জমিতে চাষাবাদ শুরু করেন। একপর্যায়ে তাদের ঋণ পরিশোধ হলে পরবর্তীতে ২য় দফায় ২০,০০০ টাকা ঋণ নেয়। দেলোয়ারা চিন্তা করলেন অন্যেরা কাজ করে স্বাবলম্বী হতে পারলে আমি কেন পারবো না।

দেলোয়ারা ও তার স্বামী অন্যের বাগানে ফুল চাষ করত তাই তারা সিদ্ধান্ত নিলেন নিজ উদ্যোগে ফুল চাষ করবেন। যদিও সিংগাইর উপজেলায় ফুলের তেমন চাষ হয় না। তারপরও নিজের পছন্দ মোতাবেক স্বামীর সাথে আলোচনা করে ফুল চাষ শুরু করবেন বলে মনস্থির করলেন। দেলোয়ারার গতানুগতিক ফুল চাষ পছন্দ ছিল না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন বিদেশী ফুল চাষ করবেন। কিন্তু বিদেশী ফুল চাষ করতে হলে অনেক মূলধনের দরকার পাশাপাশি অনেক লোকবলের প্রয়োজন। শুরুতে অনেক ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। তিনি বিদেশী ফুল হিসেবে গাডিউলাস ফুল চাষাবাদের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু গাডিউলাস ফুলের চাষ শুরু করতে নগদ টাকার প্রয়োজন কারণ বিরল প্রজাতির চারা সচারাচর পাওয়া যায় না। তাই দেলোয়ারা ৩য় দফায় ৪০,০০০ টাকা ঋণ নেয় এবং বাবার বাড়ি থেকে ৩০,০০০ হাজার টাকা এনে নিজের তিন শতাংশ জমি ও বন্ধক নিয়ে ২০ শতাংশ জমিতে গাডিউলাস ফুলের চাষ শুরু করেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের অক্লান্ত পরিশ্রমে পথ চলা শুরু দেলোয়ারার। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি দেলোয়ারাকে। মূলধন অল্প তাই লোক দিয়ে কাজ করানোর সুযোগ ছিল না। তাদের সাথে তার দুই ছেলে-মেয়েও কাজে সহযোগীতা করত। দেলোয়ারার ছিল শুধু ইচ্ছা ও সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়। দেলোয়ারার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল না। পর্যায়ক্রমে দেলোয়ারা ৫০,০০০ ও

গাডিউলাস ফুলের চাষ ভালো হওয়ায় হাসোজ্জ্বল দেলোয়ারা

১,০০০০০ টাকা ঋণ নিয়ে সঠিকভাবে পরিশোধ করেছে। এবং সর্বশেষ ২,২৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছে। আজ তিনি উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে তার ৫০ শতাংশ জমি রয়েছে বসতভিটা ছাড়া।

দেলোয়ারার উৎপাদিত ফুল বাজারজাত করা হয় কারওয়ান বাজার, ফার্মগেইট ও শাহবাগে। বিভিন্ন এলাকা থেকে তার চাষ করা গাডিউলাস ফুল পাইকারী দামে ব্যবসায়ীরা কিনে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করে। প্রতি মাসে তার মাসিক আয় ৪০,০০০ থেকে ৪৫,০০০ টাকা। এতে তার ভাগ্যের যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনি পরিবর্তন হয়েছে তার গ্রামের অসহায় ও দুস্থ মহিলাদের। ৬ জন দুস্থ মহিলা ও তাদের পরিবারের ৫ জন সদস্য গাডিউলাস ফুলের চাষের সাথে জড়িত।

সিংগাইর এলাকায় অনেক চাষী এখন গাডিউলাস ফুল চাষ করছেন। শীতকালে ফুলের চাহিদা অনেক বেশী থাকে। বিক্রি ভালোর কারনে লাভ বেশী হয়। সারা বছরই গাডিউলাস ফুল হয় তাই এই ফুল চাষে দেলোয়ারাকে অনেক বেশী ব্যস্ত থাকতে হয়। দেলোয়ারার পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। তার তিন ছেলেমেয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি সরাসরি ফুল চাষের সাথে সম্পৃক্ত ও এক ছেলে এইচ.এস.সি দ্বিতীয় বর্ষে ও ছোট মেয়ে দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। দেলোয়ারার পরিবার ভালো জামা-কাপড় ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করছে। সংসারের প্রয়োজনীয় অনেক আসবাব যেমন টিভি, ফ্যান, ঘড়ি, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি রয়েছে দেলোয়ারার সংসারে। তার ঘরের সংখ্যা মোট চারটি। আধা-পাকা ঘর দুইটি ও কাঁচা ঘর দুইটি। ভবিষ্যতে তার পাকা বাড়ি তৈরি করার ইচ্ছা আছে। সমাজে তাঁর এখন সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক যেকোন সিদ্ধান্ত স্বামী-স্ত্রি মিলে গ্রহণ করে থাকেন। দেলোয়ারা মনে করেন একা কোন কাজ করে সফলতা পাওয়া যায় না। জীবনে সফলতা আনতে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের একসাথে কাজ করতে হবে না হলে সফলতা সম্ভব না। তার এই সাফল্যে দেলোয়ারা সৃষ্টিকর্তার প্রতি শুকরিয়া আদায় করেছেন ও তিনি ভার্কের প্রতি কৃতজ্ঞ।

সংগ্রহে: আইবিআইজি সেকশন
ভার্ক হতে প্রকাশিত

স্বপ্নের পথে সাফল্যের সিঁড়ি

আমাদের দেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র পরিবারের অনেক স্কুলগামী শিক্ষার্থী আছে যারা পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে না। আবার যারা লেখাপড়া শুরু করে তাদের মধ্যে অনেক শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষাচক্র শেষ করার আগেই মাঝপথে ঝরে যায়। অভাবগ্রস্ত বাবা মা তার আদরের সন্তানকে অল্প বয়সে শিশুশ্রমে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। অদম্য ইচ্ছার কারণে অনেক শিশু রোজগার করে লেখাপড়া চালিয়ে যায়। তেমনি দরিদ্র পিতার মেধাবী শিশু মোঃ সোহাগ আলী।

মোঃ সোহাগ আলী, বয়স-১১ বৎসর, পিতা- মোঃ শাহজাহান আলী, মাতা- জাহানারা বেগম, নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলায় চামারী ইউনিয়নের গুটিয়া মহিষমারী গ্রামে বাস করে। সোহাগের বাবা-

পেশায় একজন দিন মজুর। তার মা বাবা লেখাপড়া জানে না। ২ ভাই ২ বোনের মধ্যে সোহাগ সবচেয়ে বড়। তাদের পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৬ জন। পরিবারে তাকে লেখাপড়া শেখানোর মত কোন লোক ছিল না। দিন মজুর বাবার পক্ষে পরিবারের ব্যয়ভার বহন করা খুবই কষ্টসাধ্য। চার সন্তান সবাই ছোট থাকায় পরিবারে প্রতিদিনের খরচ মেটাতে এবং সন্তানদের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য স্বামীর পাশাপাশি সোহাগের মা জাহানারা সারাদিন স্বল্প মজুরিতে মাটি কাটার কাজ করেন। সোহাগ পরিবারের বড় ছেলে কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্বেও দারিদ্র্যতার নিকট পরাজিত হয়ে ছেলেকে পার্শ্ববর্তী বিলদহর বাজারে ইলেক্ট্রিক ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে দেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কাজ করে সে মজুরী পায় ৮০/= টাকা, যা সংসারের খরচ যোগানে সাহায্য করে। পিতা শাহজাহান আলী মনে মনে ছেলে সোহাগের লেখাপড়া করানোর ইচ্ছা করলেও অভাবের কারণে লেখাপড়া করানোর সাহস পাচ্ছিলেন না। সোহাগের বয়স যখন ৮ বছর তখনও সে কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। মা-বাবা মনে করতেন যে তার ছেলেকে স্কুলে পাঠালে বই, খাতা, কলম ও অন্যান্য উপকরণ কিনে দিতে হবে যার খরচ বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সোহাগের স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া অনেকটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সোহাগ তার সমবয়সী শিশুদের সাথে স্কুলে যেতে না পেরে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং মনে মনে ভাবে সে যদি তার বন্ধুদের মত স্কুলে যেতে পারত তাহলে পড়ালেখা করে বড় হয়ে একজন আদর্শ মানুষের মত মানুষ হতে পারতো। এ রকম নানান কথা তার নিষ্পাপ মনে জেগে উঠে।

২০১৩ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে সেভ দ্য চিলড্রেন এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) কর্তৃক বাস্তবায়িত শিখন কর্মসূচির মাধ্যমে গুটিয়া মহিষমারী গ্রামে শিখন স্কুল শুরু হয়। শিখন স্কুলে পড়াশোনার জন্য কোন টাকা-পয়সা খরচ লাগে না এবং বিনামূল্যে বই, খাতা, কলম পাওয়া যাবে। এই খবর সমবয়সী ও শিখন কর্মীর নিকট থেকে জানতে পেয়ে সোহাগ তার মা-বাবাকে বুঝিয়ে গুটিয়া মহিষমারী শিখন স্কুলে ভর্তি হয়। শিখন স্কুলের নিয়মিত ছাত্র সোহাগ তার স্কুলের আপা ইফ্‌ফাত আরার আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালবাসায় লেখাপড়ার প্রতি অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক তার মেধা খাটিয়ে ও ১ ঘন্টা অতিরিক্ত সময়ে পড়ান। ফলে লেখাপড়া করে বড় হয়ে সমাজের জন্য কাজ করার দৃঢ় মনোভাব তৈরী হয় এবং মনে মনে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নিজকে প্রস্তুত করে। সে চতুর্থ শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় সকল বিষয়ে এ+ পেয়ে সফলতার সাথে লেখাপড়া করছে। বর্তমানে সোহাগ ৫ম শ্রেণীতে মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করছে।

পরিবারে আয়ের লোক না থাকায় পরিবারে সহযোগিতা করতে সোহাগ স্কুল ছুটির পর বিলদহর বাজারে পূর্বের ইলেক্ট্রিক ফ্যাক্টরীতে বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কাজ করতে হয় এর জন্য সে দৈনিক ৪০ টাকা মজুরী পায়। পড়ালেখার প্রতি অদম্য আগ্রহ থাকার ফলে কাজের পরে রাত জেগে প্রতিদিনের সকল বিষয়ের লেখা ও পড়ার কাজ নিয়মিত করে।

এ বিষয়ে শিক্ষিকা বলেন- "সোহাগ একজন মেধাবী ছাত্র। শেখার প্রতি অদম্য আগ্রহ থাকার কারণে কাজ শেষ করে প্রতিদিনের পড়া তৈরি করে ক্লাসে আসে।

সোহাগের মা বলেন- "শিখন স্কুলে বিনা খরচে পড়ালেখা করানোর জন্যই তার ছেলের মনে স্বপ্ন জেগেছে। সে পড়ালেখা করে একজন ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।"

সোহাগ বলে: "আমি লেখাপড়া করতে পেরে খুব খুশি। এই শিখন স্কুল না হলে হয়তো আমি কোনদিন লেখাপড়া করতে পারতাম না। শিখন স্কুল আমার আশা পুরাইছে"।

-মোঃ আব্দুল আলীম খান
এফসি, গুরুদাসপুর ফিল্ড অফিস

শিখন স্কুলের জন্য একজন বিদ্যোৎসাহী মানুষের অবদান

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহযোগিতায় সেভ দ্য চিলড্রেনের কারিগরি সহায়তায় ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) কর্তৃক বাস্তবায়িত "শিখন প্রকল্প"-এর কার্যক্রম রাজশাহী অঞ্চলের নাটোর জেলাতে ২০১৩ সালের জানুয়ারী হতে শুরু হয়। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামে গ্রামে শিখন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। আর এ স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ। এমনি একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি মোঃ আলী আকবর (মিন্টু), বয়স ৪৫, গ্রাম: ভবানীপুর, ইউনিয়ন: জোয়ারী, উপজেলা: বড়াইগ্রাম, জেলা: নাটোর। তিনি ভবানীপুর শিখন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

২০১৩ সালের জানুয়ারি মাস। বিভিন্ন এলাকার দরিদ্র, অসহায়, ঝড়ে পড়া শিশুদের শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য শিখন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এমনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিখন টিমের কর্মীরা ভবানীপুর গ্রামে যান। সেখানে স্কুল করার জন্য ঘর পাওয়া যাচ্ছিল না। গ্রামে স্কুল হবে, গরীব ও অসহায় শিশুরা বিনা টাকায় পড়তে পারবে এমন এক সুযোগের কথা আলী আকবর (মিন্টু) জানতে পারেন। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি শিখন বড়াইগ্রাম ফিল্ড অফিসে এসে শিখন কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে কমিউনিটির শিখন স্কুলের চাহিদার কথা তুলে ধরেন। তাকে বলা হয় স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ঘর, শিশু ও সকল শিশুর (এনওসি) সংগ্রহ এই তিনটি শর্ত পূরণ হলে আমরা সেখানে স্কুল দিতে পারবো। তখন আলী আকবর (মিন্টু) বলেন, আমি এই গ্রামের অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এ জন্য আমি আপনাদের সকল কাজে সহায়তা করতে চাই।

পরের দিন থেকে তিনি গ্রামবাসীকে নিয়ে নেমে পড়েন স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে। শিখন কর্মীদের সাথে শিশুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের সাথে কথা বলে শিশু সংগ্রহ শুরু করেন এবং পাশাপাশি স্কুল ঘর করার জন্য একটি জায়গা খুঁজতে থাকেন। এভাবেই কেটে গেল বেশ কিছুদিন। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। তিনি নিয়মিত শিখন কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করেন। স্কুল করার জন্য যখন ঘর পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, তখন তিনি কমিউনিটির অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের লেখাপড়ার কথা ভেবে নিজের জায়গার উপর নিজ খরচে একটি স্কুল ঘর তৈরি করে দেন। এরপর সেখানে শিখন কর্মীর সহায়তায় শিশু ভর্তির কাজ শুরু হয়। প্রথমে অল্প কিছু সংখ্যক শিশু ভর্তি হয়। কিন্তু গরীব ও অসহায় অনেক শিশু বাদ পড়ে যায়। এ ভর্তিকৃত শিশুদের (এনওসি) সংগ্রহ করতে গিয়ে শিখন কর্মীরা নানা বাধার সম্মুখীন হলে তিনি নিজে গিয়ে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে বুঝিয়ে ভবানীপুর শিখন স্কুলে ভর্তিকৃত সকল শিশুর এনওসি সংগ্রহে সহায়তা করেন। এভাবে তার অদম্য প্রচেষ্টা ও শিক্ষানুরাগী মনোভাবের ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয় ভবানিপুর শিখন স্কুল। বর্তমানে স্কুলে ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা ৩৪ জন এবং স্কুলটি একটি 'এ' গ্রেডের স্কুল। এখন তিনি প্রতি সপ্তাহে একবার করে স্কুল পরিদর্শন করেন। শিখন স্কুলের শিক্ষিকাদের পাঠদানের গুণগত মানোন্নয়ের জন্য প্রতিমাসে ভবানীপুর স্কুলে এমটিটিপিএম পরিচালিত হয়। শিশু ও শিক্ষিকাদের বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের জন্য টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন স্থাপন করে দেন। আলী আকবর (মিন্টু) নিজের স্কুল ছাড়াও তার আশেপাশে এলাকায় পরিচালিত সকল শিখন স্কুল পরিদর্শন করে স্কুলের সভাপতিদের স্কুল পরিচালনায় বিশেষ করে সার্বিক পরামর্শ দেন এবং জাতীয় দিবস পালনে উৎসাহিত করেন।

ভবানীপুর শিখন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলী আকবর (মিন্টু) বলেন, "সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টিতে আমি কাজ করতে পেরে ধন্য। আমার বাড়িতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এলাকায় ভিন্ন আঙ্গিকে আমার পরিচিতি বেড়েছে"।

সমাজের মানুষ যে কোন ভাল কাজে আমার মতামতের গুরুত্ব দেন। শিখন স্কুলের কার্যক্রমে এলাকাবাসী মুগ্ধ হয়ে স্কুলের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

যে কোন মূল্যেই হোক আমি আমার শিখন স্কুলের সকল শিশুকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় এ-গ্রেড পাওয়াবো, যার মধ্যে বেশিরভাগই এ+ থাকবে।"

-দুলাল করিম
ফিল্ড সমন্বয়কারী ভার্ক-শিখন কর্মসূচি
বড়াইগ্রাম, নাটোর

শিকন হামার নাতনীক নেকাপড়া শিকেইল

সারিয়াকান্দি উপজেলা হতে প্রায় ৪১ কিলোমিটার দূরে চরে অবস্থিত যমুনা নদীবেষ্টিত চর ধারাবর্ষা গ্রাম। ২৫ কিলোমিটার যমুনা নদী পার হয়ে যেতে হয়। উক্ত চরে ১৮০০ পরিবারের বসবাস। যমুনা নদী বেষ্টিত চর হওয়ার কারণে আধুনিক সভ্যতার আলো সেখানে পড়েনি। এলাকাবাসীর জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় মাছ ধরা ও কৃষিকাজ। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ার কারণে ধারাবর্ষা চরে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেভাবে গড়ে ওঠেনি। ফলে স্কুল বয়সী শিশুরা বাড়ীতে থাকে, কেউ বা আবার অন্যের ক্ষেতে মজুরী বিক্রি করে এবং মাছ ধরে জীবন যাপন করে।

২০১২ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে, সেভ দ্য চিলড্রেনের কারিগরী সহযোগিতায় ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার-ভার্ক "শিখন কর্মসূচি" শিরোনামে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। শিখন স্কুলের শিক্ষার্থী মোছাঃ মমতা খাতুন বয়স ১১ বছর ৩ মাস, তারা দুইবোন। পিতা মোঃ আনোয়ার হোসেন, মাতা মোছাঃ রেনুকা বেগম। তার বাবা ছোটবেলা তাদেরকে ছেড়ে চলে যায়। তার মা অনেক খোঁজ খবর নিয়ে অন্য মানুষের নিকট থেকে জানতে পারেন তাদের বাবা ঢাকায় গার্মেন্টস-এ চাকুরি করেন। তার মা স্বামীকে খুঁজে বের করতে ঢাকা চলে যান। চার বছর ধরে তার মা-বাবা কেউ আর বাড়ি ফিরে আসেনি। কোন উপায় না থাকায় দুই বোন নানার আশ্রয়ে ওঠে। অসহায় নানা ধারাবর্ষায় একটি চায়ের দোকানদার। দিন আনে দিন খায়। অভাবের সংসারে আরও দুটি নাতনী যেন মরার উপরে খাড়ার ঘা। তার নানা অতি দরিদ্র। নিজের কোন জমিজমা নাই। সরকারি চরে একটি চালার ঘর তুলে বসবাস করে।

কর্মসূচির শুরুতেই শিশু জরিপকালে ধারাবর্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুদু বলেন, বড় ধারাবর্ষা গ্রামটি যমুনার চর নদী দ্বারা বিভক্ত হওয়ার কারণে শিশুরা আমার স্কুলে আসতে পারে না। সেখানে শিখন স্কুল প্রতিষ্ঠিত করলে শিশুরা লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। তাই ভার্ক-এর শিখন টিম সেখানে শিখন স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। যার ফলে লেখাপড়া করার সুযোগ পায় মোছাঃ মমতা খাতুন। সকাল ৭টা থেকে ৮.৩০ মিঃ পর্যন্ত নানার সাথে চা বিক্রি করে মমতা। এর পরে শিখন স্কুলে যায়। স্কুল শেষ হওয়ার পরে আবারও শুরু হয় নানার দোকানে চা বিক্রি। নিজেই চা তৈরি করে এবং সেই চা নিজেই ক্রেতাদের নিকট পৌঁছে দেয় ও চায়ের দাম নিয়ে আসে। তার চোখে মুখে স্বপ্ন প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে জিপিএ ৫ রেজাল্ট অর্জন করা। সেজন্য সে নানার দোকানের কাজ শেষ করে হারিকেনের মিটিমিটি আলোতে পরের দিনের পড়া তৈরি করে এবং দোকানের কাজ শেষ করে শিখন স্কুলে আসে। তার নানা বলে আমি মূর্খ্য মানুষ। লেখাপড়া জানি না। আমার দোকান থেকে অনেক সোদা বাকীতে বিক্রি করি। আমি লিখতে পারি না। আমার নাতনি এখন আমার ছোট দোকানের সকল হিসাব করে দেয়। আমি কখনো স্বপ্নেও দেখিনি এমন একটি চরে কখনো স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সে স্কুলে আমার নাতনি লেখাপড়া করে নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে পারবে। এ যেন আমার কাছে আকাশ কুসুম কল্পনার মত ।

মমতা খাতুন-এর নানা সে তার নাতনিকে নিয়ে অহংকার করে বলেন, "শিকন হামার নাতনীক নেকাপড়া শিকেইল।"

মমতা বলে, শিখন স্কুল হওয়ায় আমি লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছি। আমি পঞ্চম শ্রেণি পাশ করে হাই স্কুলে ভর্তি হবো। জীবনের সব পড়া শেষ করে চাকরী করবো, ছোট বোনকেও লেখাপড়া শিখাবো।

মমতা খাতুনের মত অনেক শিশু রয়েছে যারা লেখাপড়ার স্বপ্ন দেখে কিন্তু অভাবের কারণে এবং স্কুল না থাকায় পড়ালেখার সুযোগ পায় না। ধারাবর্ষা গ্রামের সকল শিশু এখন নতুন দিনের স্বপ্ন দেখে।

-মোঃ মোত্তালেব হোসেন
টিটিএস, ভার্ক-ধুনট বগুড়া

সুস্থ জীবন সুন্দর পরিবেশ

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর বাস্তবায়নাধীন ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)-এর সহযোগিতায় জলবায়ু পরিবর্তনপ্রসূত খরাজনিত সমস্যা মোকাবেলায় জন-সামর্থ্য বৃদ্ধি (Community Capacity Building to Face challenges of Drought as an Effecte of Climate Change) নামক একটি প্রকল্প নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ০৪ (চার)টি ইউনিয়ন (হাজীনগর, চন্দননগর, রসুলপুর ও বাহাদুরপুর) বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনপ্রসূত খরাজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে অভিযোজন হিসাবে লক্ষিত কমিউনিটির সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খরা এবং অন্যান্য দূর্যোগ-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে কমিউনিটির সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং অভিযোজন হিসাবে যথাযথ খরাজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের ভালাইন ঘাটি গ্রামের মোছাঃ শাহিদা খাতুন, স্বামী মোঃ আবুল হোসেন ০২ জন নারীসহ পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা ৫ জন। শাহিদা খাতুনের বিয়ে হয় ভূমিহীন পরিবারে। বিয়ের পর থেকেই জীবন সংগ্রাম করে সংসার পরিচালনা করতে হয় তাকে। শাহিদা খাতুনের স্বামী দিন মজুরের কাজ করে যে অর্থ উপার্জন করে তার বেশির ভাগ ব্যয় করে তার স্ত্রীর চিকিৎসা করতে। শাহিদা খাতুনের বিয়ের পর থেকেই রান্নার কাজে প্রচলিত চুলা ব্যবহার করে আসছে। যার ফলে বাড়ি-ঘরসহ আসবাবপত্র কালো হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। কালো ধোঁয়া শ্বাস-প্রশ্বাস-এর মাধ্যমে শরীরের ভিতরে প্রবেশ করায় সর্দি-জ্বর, কাঁশি, চোখ জ্বলা, বুক জ্বলা, মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা, রাতে ঘুম কম ইত্যাদি ধোঁয়াজনিত রোগ প্রায়ই দেখা দেয়। এতে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চুলায় রান্না দেরিতে হওয়ায় তার দিনমজুর স্বামীকে সময়মতো খাবার দিতে পারতো না। এমন সময় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর বাস্তবায়নাধীন ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)-এর সহযোগিতায় জলবায়ু পরিবর্তনপ্রসূত খরাজনিত সমস্যা মোকাবেলায় জন-সামর্থ্য বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। শাহিদা খাতুন ভার্ক সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর ভালাইন ঘাটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলা দলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে এবং প্রতি মাসে দলীয় সভার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা, সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ণয়, বৃক্ষরোপণ, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ময়লা-আবর্জনা গর্ত করে ফেলা, নিয়মিত স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সাবান পানি দিয়ে হাত ধৌত করা ইত্যাদি সচেতনতামূলক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। শাহিদা খাতুন

দলীয় সভায় উন্নত চুলার উপকারিতা সম্পর্কে জেনে তা পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। ভার্ক-এর নীতিমালা অনুযায়ী সকল দিক বিবেচনা করে তার বাড়িতে একটি পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা স্থাপন হয় এবং নিয়মিত ব্যবহার করেন। এখন আর কালো ধোঁয়া হয় না। বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। তিনি এখন শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন। চিকিৎসার জন্য আর তার স্বামীর কষ্টের টাকা ব্যয় করতে হয় না। পরিবারে সময়মতো রান্না হয়। শাহিদা খাতুন পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা অন্যকে ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করেন। সে সুস্থ থাকার জন্য ভার্ক-এর প্রতি কৃতজ্ঞ।

সিসিসিপি-নিয়ামতপুর, নওগাঁ

স্বপ্ন পূরণে স্যানিটেশন

সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার ঘুড়কা ইউনিয়নের অন্তর্গত ভুঞাগাঁতি সোনারচর কমিউনিটিতে বাস করেন মোঃ আয়নাল হক (৪৪) পিতা: মৃত আশরাফ আলী, তিনি পেশায় একজন মাছ ব্যবসায়ী। স্ত্রী ও ২ মেয়ের সংসারে তিনিই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। অর্থনৈতিকভাবে তিনি খুবই দরিদ্র। বড় মেয়ে দশম শ্রেণি এবং ছোট মেয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে লেখাপড়া করছে। আয়নাল মিয়ার দীর্ঘ ১৭ বছর মাছ ব্যবসায়ী জীবনের পাশাপাশি বড় শখ ছিল জনগণের কল্যাণে কিছু একটা করার জন্য। আর তাই ইচ্ছা ছিল জনপ্রতিনিধি হওয়ার। কিন্তু তার পূর্বে জনগণের কল্যাণে কিছু কাজ করে তাদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি ও পরিচিতি হওয়ার মত তেমন কোন কাজ তিনি করতে পারেননি। গত দেড় বৎসর পূর্বে ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) কর্তৃক বাস্তবায়িত ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্টের আওতায় ভূঞাগাঁতি সোনারচর কমিউনিটিতে কমিটি গঠনকালে তাকে সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হয় এবং পরবর্তীতে তিনি সিবিও কমিটির ক্যাশিয়ার হিসাবেও নির্বাচিত হন। তখন থেকেই তিনি জনগণের কাছে যাওয়ার জন্য এটাকে একটা বড় সিঁড়ি হিসাবে মনে করে ভার্ক কর্মীর সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মিটিং-এ উপস্থিত থাকতেন। তিনি সিবিও সদস্য হিসাবে তার ওয়ার্ডে ১১টি নলকূপের গোড়া পাকা এবং ৩টি নতুন নলকূপ স্থাপনে সহায়তা করেন। তাছাড়া বিভিন্ন হতদরিদ্র এবং দরিদ্র পরিবারে স্যাটো প্যান/ভার্ক প্রদত্ত ল্যাট্রিন প্রদানের জন্য ওয়ার্ড ওয়াট-সান কমিটির নিকট সুপারিশ করেন এবং তাদের জন্য ল্যাট্রিন নিশ্চিত করেন। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন ইউপি সদস্য ধনী/মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য কোন ল্যাট্রিন বরাদ্দ করলে তিনি তা প্রতিবাদ করতেন এবং অন্য কোন হতদরিদ্র পরিবারকে প্রদান করতে বাধ্য করতেন। এভাবে দিন যেতে যেতে চলে আসে সেই কাঙ্খিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ঘুড়কা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। নির্বাচন পরবর্তীতে তার অনুভূতি জানতে চাইলে ভার্ক কর্মীর কাছে বলেন, "আমাকে জনগণের এত কাছে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে ল্যাট্রিনের কাজ অর্থাৎ ভার্কের কাজ এবং এই কাজই আমার স্বপ্ন পূরণের প্রধান মাধ্যম। ভার্কের কাজের সাথে ওভাবে নিজেকে না জড়ালে আমার স্বপ্ন হয়তো এভাবে পূরণ হতো না।" তিনি এজন্য ভার্কের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

"আমাকে জনগণের এত কাছে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে ল্যাট্রিনের কাজ অর্থাৎ ভার্কের কাজ এবং এই কাজই আমার স্বপ্ন পূরণের প্রধান মাধ্যম। ভার্কের কাজের সাথে ওভাবে নিজেকে না জড়ালে আমার স্বপ্ন হয়তো এভাবে পূরণ হতো না।"

ওয়াশ রেজাল্ট প্রকল্প আশা করে রায়গঞ্জের প্রতিটি মানুষই আয়নাল হকের মত রায়গঞ্জের স্যানিটেশন কার্যক্রমকে জনসেবার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে নিয়ে ১০০ ভাগ খোলা পায়খানা মুক্ত রায়গঞ্জ উপজেলা ঘোষণা করে উদাহরণ তৈরি করবেন।

মোঃ রফিকুল ইসলাম, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার
ভার্ক, ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ

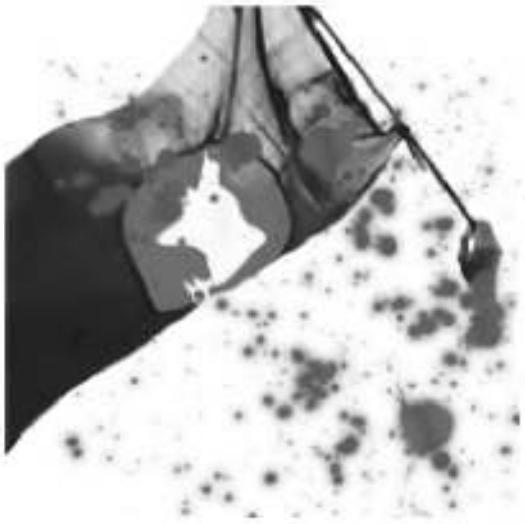

হে স্বাধীনতা

রুমানা ডালিয়া
সহ-সমন্বয়কারী, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ সেকশন, ভার্ক

তুমি শত বছরের লালিত মায়ের স্বপ্নিল আশা।
জনম জনম ধরে এ বাংলার তরে
তুমি বেঁধেছ বাসা।

হে স্বাধীনতা, তুমি থাকো জনতার ভীড়ে
আরো থাকো হারমনি আর গীটারের তারে।
এ হৃদয় বীণায় বাজতে থাক তুমি
চির করুণ সুরে।

হে স্বাধীনতা,
হার মেনেছ তুমি শত কোটি
ক্ষুধার্ত জনতার মিছিলের কাছে
আরো দূর্বল হয়ে পড়েছ তুমি
রক্তে রঞ্জিত সালাম, বরকত
আর রফিক জব্বারের নব তারুণ্যের কাছে।

হে স্বাধীনতা,
তুমি চির অম্লান হয়ে থাকবে
আমাদের রক্তে ভেজা শিথিল হৃদয়ে
উজ্জ্বল তারকা হয়ে।।

চৈত্রের প্রথম বর্ষণ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শহীদুল হক
ভার্ক, প্রধান কার্যালয়

চৈত্রের প্রথম বর্ষণ, তারপর রৌদ্র
ভীষণ তাপদাহ ভ্যাপসা গরম, অতিষ্ঠ জনজীবন
তবুও স্বস্তি বহিছে বাতাস।

আবার কোথাও কোথাও ভূ-কম্পন
ভীত মানুষ দ্রুত ঘর ছেড়ে নিয়েছে আশ্রয়,
খোলা আকাশের নীচে
নীরব নিস্তব্ধ মানুষের ভয়, আবার না জানি কি হয়!

পর দিন শুনি শিলং, গোহাটি, হয়েছে ভীষণ ক্ষতি
বাংলাদেশেও লেগেছে তার কিছুটা ঝাকুনি
ফাটল ধরে হেলেছে অনেক বসতি
ভয় ভীষণ আবার না জানি কি হয়!

হে দয়াময় বিধাতা দয়া কর মোদের প্রতি
হতে দিওনা আর কম্পনে এদেশের ক্ষতি।

পিতার্থ

রিফা তাসফিয়া বৃষ্টি

তখন আমি খুবই ছোট, ভর্তি হলাম হবে;
সবাই হয়তো ভুলেই গেছে, হয়েছিলো কবে।

খুবই সহজেই, সব কথায়, বাবা হয়ে যেত রাজি,
তার মতো আর কেউ ছিল না, ধরতে পারি বাজি।

রোজ রাতে পরীর গল্প, শোনাতো মা যখন;
বাবা তার আদুরে হাত বুলিয়ে দিতো তখন।

বাবা প্রায়ই মার দায়িত্ব পালন করত নিজে,
ভাত মাখিয়ে খাইয়ে দিত জননী মোর সেজে।

এসবই কল্পনা মোর, সত্যি হয়নি করা,
হয়তো হতো যদি বাবা একবার দিতেন ধরা।

আজও আমার মনে জাগে সেই রাতের কথা,
মোর পানে মা তাকিয়ে ছিলো, লুকিয়ে সব ব্যথা।

সেদিন কেমন কাঠের খাটে, শুইয়ে ছিলে তুমি,
জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি শুধু আমি।

ধীরে ধীরে বোধ হলো, কাটল যখন দিন,
বুঝলাম দিন কাটাতে হবে, এখন তোমায় বিন।

হাত ধরে মহাসড়ক পার করাতে তুমি,
আজ তুমি নেই সড়ক ধারে, দাঁড়িয়ে থাকি আমি।

অনেকেরই মাঝে দেখি, তোমার প্রতিচ্ছবি,
তবু আছো, তুমি আমার আঁধার দিনের রবি।

মা আমার প্রায়ই বলে, বাবার মতোই তো হয়েছিস,
কিন্তু সত্যি বলব আজও বুঝলাম না আমি, পিতার্থ কি জিনিস।

আরিফা আক্তার, ১ম শ্রেণি, তার্ক শিশু শিক্ষা কেন্দ্র

আহমেদ মাসফি, থার্ড গ্রেড, তার্ক শিশু শিক্ষা কেন্দ্র

চিরচেনা অ্যালোভেরা জেলের ৫টি অজানা স্বাস্থ্য উপকারিতা

অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারী- এই পাতাটি রূপচর্চায় ব্যবহার হয়ে আসছে আদিকাল থেকে। বহুগুণী এই পাতাটি শুধুমাত্র রূপ বা চুল পরিচর্যায় ব্যবহার হয় না, এর ঔষধি গুণাবলিও অনেক। বহু রোগের সমাধান করে থাকে ছোট এই একটি পাতা। অ্যালোভেরার পাতার ভিতরে থাকা জেলটি ব্রণ দূর করা থেকে শুরু করে আগুনে পুড়ে যাওয়া ত্বক সারাতে সাহায্য করে থাকে। এমনকি অনেক ঔষুধ তৈরি করতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে অ্যালোভেরা জেল। রূপচর্চায় অ্যালোভেরার জেলের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা সবাই জানি, আজ এর ঔষধি গুণাবলী সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

১। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি

অ্যালোভেরা হল অ্যান্টি ফাঙ্গাল এবং অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান সমৃদ্ধ একটি উদ্ভিদ। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং দেহের টক্সিন উপাদান দূর করে থাকে। অ্যালোভেরা জেলের জুস নিয়মিত পান করতে পারেন।

২। মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে

২০১৪ সালে এক গবেষণায় দেখা গেছে অ্যালোভেরা জেল মাউথ ওয়াশের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এতে ভিটামিন সি আছে যা মুখের জীবাণু দূর করে মাড়ি ফোলা, মাড়ি থেকে রক্তপাত বন্ধ করে দিয়ে থাকে। এছাড়া মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে।

৩। ডায়াবেটিস প্রতিরোধে

অ্যালোভেরা রক্তে সুগার নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। থাইল্যান্ডে এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রতিদিন দুই টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জুস রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এবং ডায়াবেটিস রোগ হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে থাকে।

৪। মুখের ঘা প্রতিরোধে

মুখের ঘা এবং দাঁতের পোকা রোধ করতেও অ্যালোভেরা জেল কার্যকরী। মুখের ঘায়ের স্থানে অ্যালোভেরা জেল লাগিয়ে নিতে পারেন, এটি ঘা ভাল করতে সাহায্য করে।

৫। ক্যান্সার প্রতিরোধে

নতুন গবেষণা অনুসারে অ্যালো-ইমোডিন নামক উপাদান অ্যালোভেরা জেলে রয়েছে যা স্তন ক্যান্সার ছড়ানো রোধ করে থাকে। অন্যান্য ক্যান্সার প্রতিরোধেও অ্যালোভেরা জেল বেশ কার্যকরী।

৬। ওজন কমাতে

অ্যালোভেরা জেলে ম্যাগনেশিয়াম, কপার, পটাশিয়াম, আয়রন, সোডিয়াম, জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম আরও অনেক মিনারেল রয়েছে যা ওজন হ্রাস করতে সাহায্য করে থাকে। এছাড়া অ্যালোভেরা জেলে প্রায় ২০ রকম অ্যামিনো অ্যাসিড আছে যা ইনফ্লামেশন এবং ব্যাকটেরিয়া রোধ করে হজম, বুক জ্বালাপোড়া রোধ করে থাকে।

তথ্য সংগ্রহ ওয়েব সাইট

জেনে নিন আদার ৮টি উপকারিতা

আদা যে শুধুমাত্র রান্নার স্বাদ ও ঘ্রাণ বাড়ানোর কোনো মসলা জাতীয় কিছু নয় তা এখন আর কারো অজানা নয়। আদার ঔষধি গুণাগুণ সম্পর্কে প্রায় সকলেই বেশ ভালোভাবেই অবগত আছেন। নিয়মিত আদা খাওয়ার অভ্যাস মুক্তি দিতে পারে মারাত্মক বেশ কিছু রোগ থেকে।

১) বমিভাব বা বমি হচ্ছে অনেক? আদা কুচি করে চিবিয়ে খান অথবা আদার রসের সাথে সামান্য লবণ মিশিয়ে পান করুন। তাৎক্ষণিক সমাধান পেয়ে যাবেন।

২) উল্টাপাল্টা এবং বেশি ভাজাপোড়া খাবারের কারণে বুকজ্বলার সমস্যা হুট করেই শুরু হতে পারে। এক কাজ করুন, ২ কাপ পানিতে ২ ইঞ্চি আদা ছেঁচে জ্বাল দিয়ে চায়ের মতো তৈরি করে পান করুন। বুকজ্বলা কমে যাবে।

৩) ধমনীতে প্লাক জমে রক্ত প্রবাহ বন্ধের সমস্যাকে বলা হয় অথেরোসেক্লেরোসিস। এই মারাত্মক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন নিয়মিত আদা খাওয়ার অভ্যাস করলে। প্রতিদিন একটু হলেও আদা খান এই সমস্যা থেকে দূরে থাকতে।

৪) অনেক দুর্বল লাগছে? দুর্বলতার কারণ যাই হোক না কেন একটু আদা খেয়ে নিন। অনেকটা শক্তি পাবেন। এরপর ডাক্তারের পরামর্শ নিন দুর্বলতার কারণ জেনে নিরাময়ে সহায়তা পেতে।

৫) আদার রস ব্যথানাশক ঔষধের মতো কাজ করে। সরাসরি আক্রান্ত স্থানে লাগাতে পারেন আদার রস অথবা পান করে নিতে পারেন, দুভাবেই ভালো উপকার পাবেন।

৬) নতুন আদার সাথে আধা সেদ্ধ ডিম খাওয়ার অভ্যাস পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা বাড়ায় এবং স্পার্ম কাউন্ট বৃদ্ধি করে।

৭) প্রাকৃতিক অ্যান্টিহিস্টামাইন এনং অ্যান্টিবায়োটিক উপাদানে ভরপুর আদা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। নিয়মিত আদা খাওয়ার অভ্যাস করলে ছোটোখাটো অনেক রোগের হাত থেকেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

৮) খেতে ইচ্ছে করছে না বা ক্ষুধা মন্দায় ভুগছেন? তাহলে খাওয়ার ৩০ মিনিট আগে আদা খেয়ে নিন। এতে ক্ষুধামন্দা দূর হবে এবং খাবারে রুচি ফিরে আসবে।

তথ্য সংগ্রহ ওয়েব সাইট

ভার্ক কর্তৃক গবাদি প্রাণি-পাখির কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান

বাংলাদেশে গবাদি প্রাণির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া। এগুলো যেকোন দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কারণ এসব প্রাণি কৃষি কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কাজে চালিকাশক্তি (Draft), চামড়া ও সারের যোগান দেয় এবং জনসংখ্যার বৃহৎ অংশের জন্য মাংস ও দুধের প্রধান উৎস। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পালিত প্রাণিসম্পদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

কৃমির সংক্রমণ বর্তমানে বাংলাদেশের গবাদি প্রাণির একটি গুরুত্বপূর্ণ সংক্রমণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃমির মধ্যে গোলকৃমি, ফিতা কৃমি জাতের কলিজাকৃমি (*fasciolla spp)* এবং পাকস্থলির কৃমির (*haemoncus spp*) সংক্রমণই বেশি

দেখা যায়। এছাড়াও দেহের বহিরাংশের কৃমির সংক্রমণও (Ecto parasite) হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ গবাদি প্রাণিসমূহকে নিয়মিত কৃমিনাশক খাওয়ানোর বিষয়ে উৎসাহী নয়। এর কারণগুলো হল- কৃমিনাশক বড়ির সহজলভ্যতা, ভ্রান্ত কিছু ধারণা যেমন : গবাদি প্রাণির দৈহিক ওজন কমে যাওয়া, দৈনিক দুধের পরিমাণ কমে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু বাজারে এখন ভালো মানের কৃমিনাশক পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলো কিনা দৈহিক ওজনে এবং দৈনিক দুধের পরিমাণে কোন প্রকার নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না। এমনকি গর্ভধারণ করা গাভীকেও খাওয়ানো যায়। কৃমি মুক্তকরণের হারও অত্যন্ত ভাল।

ভার্ক কর্তৃক গত বছর প্রায় ২৪০০ কৃমিনাশক উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। যার প্রত্যেকটির বাজার মূল্য ২২ থেকে ২৪ টাকা। কিন্তু উপকারভোগীরা ভার্কের শাখা অফিস হতে প্রতিটি কৃমিনাশক মাত্র ৪ টাকা করে সংগ্রহ করতে পেরেছে। এতে করে উক্ত এলাকাগুলোতে কৃমির সংক্রমণ অনেকাংশেই কমে এসেছে।

প্রাণি স্বাস্থ্যর আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল নিয়মিত টিকা প্রদান। নিয়মিত টিকা প্রদানে প্রাণির স্বাস্থ্য থাকে ঝুঁকিমুক্ত। চিকিৎসা ব্যয় কমে আসে শূন্যের কোঠায়। এখানেও বাংলাদেশের গবাদি প্রাণি পালনকারী ব্যক্তিদের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্যণীয়। সীমাবদ্ধতার কারণসমূহ হল- টিকার যথোপযুক্ত সংরক্ষণ, প্রশিক্ষিত টিকা প্রদানকারী এবং সর্বোপরি গণসচেতনতার ঘাটতি ইত্যাদি।

বর্তমান অর্থ বছরে ভার্ক কর্তৃক টিকা প্রদান করা হয়েছে-

ক্ষুরা রোগের টিকা- ১২০টি গরু
তড়কা রোগের টিকা- ৩২০০টি গরু
পিপিআর রোগের টিকা- ৪০০০টি ছাগল
রাণীক্ষেত রোগের টিকা- ৪০০০টি মুরগী
ডাক প্লেগ রোগের টিকা- ১২০০টি হাঁস

টিকা প্রদানের ফলে রোগের প্রাদূর্ভাব ও রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার লক্ষণীয় মাত্রায় কমে এসেছে। এছাড়াও সংস্থা হতে নিয়মিত কৃমিনাশক ও টিকা প্রদানের জন্য সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে কৃমিনাশক ও টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ দিনে-দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংগ্রহে: আইবিআইজি সেকশন
ভার্ক থেকে প্রকাশিত

বাংলাদেশের উন্নয়নে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ

জেনডিং জাতের হাঁস পালনে লাভবান খামারী

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি কাজের সাথে ৪৭ ভাগ এবং ১০ ভাগ লোক মাছ চাষের সাথে জড়িত। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ। বাংলাদেশে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়, চাহিদা মেটানোর পরও বিদেশে রপ্তানী করা হচ্ছে। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৬ ভাগ। বর্তমানে নগরায়নের ফলে প্রতি বছর ১% কৃষি জমি কমে যাচ্ছে, (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)। তবে আধুনিক প্রযুক্তি এবং উন্নত জাত উদ্ভাবনের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রাণিজ আমিষের আরেকটি প্রধান উৎস মাছ। মাছ চাষেও বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় সবচেয়ে বেশি এবং বান্দরবান জেলায় সবচেয়ে কম মাছ উৎপাদন হয়, (দৈনিক প্রথমআলো) । মাছ চাষে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে গেলেও আজ কিছু দেশীয় প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির পথে যেমন- মহাশোল, গজার, ভেদা ইত্যাদি। এসব প্রজাতির মাছ সংরক্ষণের জন্য মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন জরুরী।

বাংলাদেশে গবাদি প্রাণির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া। এ গুলো যেকোন দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, কারণ এসব প্রাণি কৃষি কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কাজে চালিকা শক্তি (Draft), চামড়া ও সারের যোগান দেয় এবং জনসংখ্যার বৃহৎ অংশের জন্য মাংস ও দুধের প্রধান উৎস। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পালিত প্রাণিসম্পদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে এ দেশে ২৫.৭ মিলিয়ন গরু, ০.৮৩ মিলিয়ন মহিষ, ১৪.৮ মিলিয়ন ছাগল, ১.৯ মিলিয়ন ভেড়া, ১১৮.৭ মিলিয়ন মুরগি এবং ৩৪.১ মিলিয়ন হাঁস রয়েছে। প্রতি একর আবাদযোগ্য জমিতে প্রাণিসম্পদের ঘনত্ব ৭.৩৭। বছরের পর বছর এদেশে প্রাণিসম্পদের ঘনত্ব বেড়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় হেক্টর প্রতি প্রাণিসম্পদের ঘনত্ব বাংলাদেশে বেশি। কিন্তু এসব প্রাণিসম্পদের সংখ্যার তুলনায় উৎপাদনশীলতা খুবই কম। দেশে বর্তমানে দুধ, মাংস ও ডিমের ঘাটতি যথাক্রমে শতকরা ৮৫.৯, ৮৮.১ এবং ৭০.৭ ভাগ। অতি সম্প্রতি এসব উপজাতের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হারে বেশ উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগামী ২০২১ সাল নাগাদ জাতীয় উৎপাদন থেকে

জমির আইলে সবজি উৎপাদন

দেশের চাহিদা মেটাতে হলে এসব উপজাতের উৎপাদন ন্যূনতমপক্ষে বছরে গড়ে শতকরা ৬ থেকে ৯ ভাগ হারে বাড়িয়ে যেতে হবে। সে জন্য প্রাণিসম্পদের উপখাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। প্রাণিসম্পদের গবেষণা ও সম্প্রসারণ খাতে প্রতি ১ টাকা বিনিয়োগ করা হলে বছরে গড়ে আয় হবে পণ্য ভেদে ১.৪২ থেকে ৩.১৫ টাকা। (বাংলাপিডিয়া, জাতীয় জ্ঞান কোষ)

টার্কিতে নতুন দিনের সূচনা

প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নানা উপাত্তনির্ভর। এগুলো হলো গবাদি প্রাণির স্বাস্থ্য সেবা, প্রাণি-সহায়ক কার্যক্রম, মানসম্পন্ন উৎপাদনের বিস্তরণ, প্রাণীসম্প্রসারন সেবা এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা। প্রাণির বিবিধ স্বাস্থ্যসমস্যা, যেমন রোগ শনাক্তকরণ, চিকিৎসা, রোগনিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ মোকাবিলা ইত্যাদি প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি প্রধান দিক। এগুলো ছাড়াও আরও কিছু অপরিহার্য দিকও রয়েছে যেমন জাত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণির শ্রীবৃদ্ধি, কৃত্রিম গর্ভধারণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ইত্যাদি। সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত খাতসহ বাংলাদেশে নানা সংস্থা প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছোট গবাদি প্রাণী। ইহা নিম্ন আয়ের মানুষের অন্যতম আয়ের উৎস। দারিদ্র বিমোচনে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী। নিজস্ব জমিতে ঘাস উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকলে খামারে বার্ষিক লভ্যাংশের পরিমাণ বেড়ে যায়। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগী বছরে দুইবার বাচ্চা দেয়, প্রতি বার ২ হতে ৪ টি বাচ্চা প্রসব করে। সাধারণত ছাগী ৬-৭ বছর পর্যন্ত গর্ভধারণ করতে পারে। অন্যান্য পশু-পাখির তুলনায় ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল এ রোগবালাই কম। সময়মত টিকা প্রদান করতে পারলে বিশেষ করে পি.পি.আর রোগের টিকা এবং মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনে রোগবালাইয়ের আশংকা অনেকাংশেই কমে আসে। সুস্বাদু ও গন্ধহীন মাংসের জন্য ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চাহিদা বিশ্বব্যাপী। ইহার দুধ অত্যন্ত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন। দুধে শতকরা ৩.৪ ভাগ প্রোটিন এবং ৪ ভাগ স্নেহ বিদ্যমান। আমিষের ঘাটতি পূরণে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দুধ এবং মাংস খুবই কার্যকর। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বর্জ্য-বিষ্টা আবাদি জমির ফসল উৎপাদনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈব সার হিসেবে একটি অর্থকরী উপাদান।

ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহারে ভাল ফলন

"পিউর ব্রিড" বলতে যা বুঝায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত এমনই একটি জাত। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বাংলাদেশের একটি মূল্যবান জাতীয় প্রাণিসম্পদ। বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ইহার জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষনে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধনকল্পে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের এগিয়ে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন।

সংগ্রহে: আইবিআইজি সেকশন
ভার্ক হতে প্রকাশিত

জাতীয় নারী নীতিমালা ২০১১

(গত সংখ্যার পর)

১০. রাজনীতি ও প্রশাসন

নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অন্তর্ভুক্তি তথা উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার প্রথম উদ্যোগ ১৯৭২ সনে বঙ্গবন্ধু সরকার গ্রহণ করে। সরকারি চাকুরিতে মেয়েদের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ অবারিত করে দশভাগ কোটা সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৭৩ সনে দু'জন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১৯৭৪ সনে একজন নারীকে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়।

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রেই নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টিতেও সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ইতিবাচক। দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী, সংসদের উপনেতা নারী। মন্ত্রিসভায় ৬ জন এবং জাতীয় সংসদে ৩৪৫ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৯ জন সরাসরি নির্বাচিত ও ৪৫ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী রয়েছেন। জাতীয় সংসদ ও তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি আজ দৃশ্যমান। ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকারে ইউনিয়ন পরিষদে ৩ জন নির্বাচিত নারী সদস্য হওয়ার বিধান প্রণয়ন করেন। শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক প্রশাসনে সচিব ও জেলা প্রশাসক পদে, পুলিশ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে নারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উপজেলা পর্যায়ে ১ জন নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়।

বর্তমানে প্রশাসনে সচিব পর্যায়ে তিনজন এবং অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ে চারজন নারী দায়িত্ব পালন করছেন। রাষ্ট্রদূত পদে তিনজন নারী বর্তমানে নিয়োগপ্রাপ্ত রয়েছেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সর্বপ্রথম নারী বিচারপতি নিয়োগ প্রদান নারী ক্ষমতায়নের নতুন মাইলফলক যুক্ত করেছে। এছাড়াও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি পদে পাঁচজন নারী, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, তথ্য অধিকার কমিশনে নারী সদস্য রয়েছেন। ক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গেজেটেড বা তদসমপদে প্রবেশ পর্যায়ে শতকরা ১০ ভাগ এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পদে প্রবেশ পর্যায়ে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ নারীদের জন্য সংরক্ষিত। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ নারী সংগঠিত পুলিশ ইউনিট (ফিমেল ফর্মড পুলিশ ইউনিট, এফপিইউ) প্রথমবারের মত হাইতিতে দায়িত্ব পালন করছে।

১১. দারিদ্র্য

দেশের শতকরা ৪০ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই নারী এবং এর মাঝে নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা অধিক। এখনও নারীর অনেক কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হয় নাই। গৃহস্থালী কর্মে নারীর শ্রম ও কৃষি অর্থনীতিতে নারীর অবদানের মূল্যায়ন দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে নারীর সঠিক মূল্যায়ন নিরূপিত হয়নি। হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

১২. নারী উন্নয়নে সাংগঠনিক ও প্রতিষ্ঠানিক উত্তরণ

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন কল্যাণ ফাউন্ডেশন, ১৯৭৬ সালে জাতীয় মহিলা সংস্থা ও ১৯৭৮ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করে। ১৯৮৪ সালে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠিত হয়। ১৯৯০ সালে পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। ১৯৯৪ সালে শিশু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নামকরণ "মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়" করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে, জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, নারীদের কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সকল জেলা ও উপজেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় মহিলা সংস্থা ৬৪টি জেলা ও ৫০টি উপজেলায় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিশুদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় নারী উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বিত করার লক্ষ্যে ৪৪টি নারী উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় পর্যায়ে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৫০ সদস্য বিশিষ্ট "জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD)" গঠন করা হয়েছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে আন্তঃমন্ত্রণালয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়েছে। নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী উভয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে সরকার সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করছে।

- বাংলাদেশে শতকরা ৪০ শতাংশ মানুষ অস্বাস্থ্যকর ও অনুন্নত টয়লেট ব্যবহার করে এবং এখনও ৪ শতাংশ মানুষ উন্মুক্ত স্থানে মল ত্যাগ করে। (সূত্রঃ জেএমপি প্রতিবেদন ২০১২, ডব্লিওএইচও/ইউনিসেফ)
- মানুষের মল থেকে ৫০টির বেশি রোগ ছড়ায়। ডায়রিয়া ও কলেরা বিস্তারের প্রধান কারণ এই মল।
- অপ্রতুল স্যানিটেশনজনিত কারণে শিশুর পুষ্টি গ্রহণ ক্ষমতা এবং শারীরিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়।
- বিশ্ব শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক একটি সমীক্ষায় দেখা যায় গত পাঁচ দশকে সাত বছর বয়সীদের গড় উচ্চতা ১১৭ সেঃ মিঃ (১৯৩৭) থেকে ১০৪ সেঃ মেঃ (১৯৪২) নেমে এসেছে। এই ১৩ সেঃ মিঃ উচ্চতা হ্রাসের কারণ হলো শৈশবে বার বার ডায়রিয়ার আক্রমণ।
- পায়খানা সৃষ্ট রোগের কারণে প্রতিদিন কয়েক লক্ষ মানুষের শ্রম হতে দেশ ও জাতি বঞ্চিত হয়।
- প্রতি পরিবারের জন্য একটি করে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে ডায়রিয়াজনিত শিশু মৃত্যু রোধ করা অনেকাংশে সম্ভব।
- আর্সেনিক দূষিত টিউবওয়েলের পানি পান ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- আপনার নলকূপের পানি আর্সেনিক দূষণে দূষিত কিনা তা স্থানীয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) বা আর্সেনিক বিষয়ে সম্পৃক্ত যে কোনো এনজিও থেকে পরীক্ষা করে নিন।
- কোনো অবস্থাতেই আর্সেনিক দূষিত পানি ফুটিয়ে পান বা রান্নার কাজে ব্যবহার করবেন না কারণ আর্সেনিক দূষিত পানি ফুটালে তাতে আর্সেনিকের মাত্রা বেড়ে যায়।
- হাত ও পায়ের তালু খসখসে হয়ে গেলে এবং চামড়ায় বাদামী বা কালো দাগ দেখা দিলে সাথে সাথেই কাছাকাছি যে কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হয়।
- স্কুলের আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখুন।
- স্কুলের টয়লেট ও টিউবওয়েলের প্লাটফর্ম পরিষ্কার রাখুন।
- টয়লেটে সাবান রাখুন এবং পানির সংস্থান রাখুন।
- স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যাভ্যাস পালনে অভ্যস্ত করুন এবং সুস্বাস্থ্যসম্মত জাতি গঠনে ভূমিকা রাখুন।

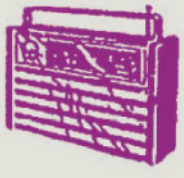

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক লায়লা ইশরাত জাহান রুমেন। শেখ আবদুল হালিম, নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক), বি-৩০ এখলাস উদ্দিন খান রোড আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা, ফোন ঃ ৮৮-০২-৭৭৪৫৪১২, ৮৮-০২-৭৭৪২০২৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭৭৪৫৭৭৯, ই-মেইল ঃ verc@bangla.net, ওয়েবসাইট : www.verc.org থেকে প্রকাশিত ও সৌরভ মিডিয়া প্রোডাক্টস, ৩৬, গ্রীন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। মূল্য: ৫.০০ (পাঁচ) টাকা মাত্র।